142.Od.444.13.

গল্পকল্পতরু।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত

চতুর্থ কুসুম

অদ্ভুত ডাকাত

উপন্যাস।

"লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাম্।
তৃষার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥"

হিতোপদেশঃ।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৫

ঔপহারিক উৎসর্গ।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

মহাশয় সমীপেষু—

প্রিয় যোগেন্দ্র বাবু,

আপনি কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের যুগান্তর করিয়াছেন। আপনার "বঙ্গবাসী" বঙ্গবাসীর যথেষ্ট উপকার করিয়াছে। তা ছাড়া, যাহারা কখন সংবাদপত্রের স্বপ্নও দেখে নাই, এমনতর হাজার হাজার লোককেও সংবাদপত্রপাঠী করিয়াছেন। ইহা বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাসীর মঙ্গললক্ষণ। এই জন্য আমি সাদরে আপনাকে আমার এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটি উপহার দিলাম।

গুণমুগ্ধ

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা।

৩রা পৌষ, ১২৯৫ সাল।

বিজ্ঞাপন।

বহু দিন হইল, আমি "হিরণ্ময়ী" ও "কিরণময়ী" নামে দুই খানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলাম। ঐ দুইখানি এক্ষণে আমার প্রথম ভাগ গ্রন্থাবলীতে আছে। হিরণ্ময়ী উপন্যাসের প্রথম ভাগ গল্পকল্পতরুর প্রথম কুসুম, দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় কুসুম এবং কিরণময়ী উপন্যাস তৃতীয় কুসুম। এক্ষণে আমার এই নবরচিত "অদ্ভুত ডাকাত" উপন্যাসটি গল্পকল্পতরুর চতুর্থ কুসুম হইল। "হিরণ্ময়ী" ও "কিরণময়ী" উপন্যাস দুই খানি কোন ভাষার কোন পুস্তক হইতে অনুবাদিত বা ভাবানুবাদিত নহে—আমার কল্পনা-প্রসূত। এই "অদ্ভুত ডাকাত" উপন্যাসও তাই।

এক্ষণে আশা এই, যদি আমার যৎসামান্য কল্পনার এই সৌরভবিহীন ফুলটি পাঠক মহাশয় ও পাঠিকা মহাশয়াকে পাঠ-পরিশ্রমের সময় যৎকিঞ্চিৎ আরামও দিতে পারে, তবে আমার রচনাপরিশ্রমের পুরস্কার লাভ হইবে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা।
৭বা পৌষ, ১২৯৫ সাল।

অদ্ভুত ডাকাত।

প্রথমাংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিকার।

আলোকের পর অন্ধকার—উত্থানের পর পতন! গৌড়ের উত্থান, পতনে পরিণত হইয়াছে। যে স্থান এক দিন লোকারণ্য ছিল, সেই স্থান এখন বৃক্ষারণ্য। রাজার প্রাসাদ, প্রজার গৃহ ধূলায় পড়িয়া, ভাঙিয়া চুরিয়া আজ কয় শতাব্দী হইতে নূতন রাজা ও নূতন প্রজাদিগকে বলিতেছে,—"চিরদিন কখনই সমান না যায়!"

সেই ভগ্নাবশিষ্ট, সুনিবিড় অরণ্যাবৃত প্রাচীন গৌড়ে মানুষের পরিবর্ত্তে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুদের বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহাদের অত্যাচারে দশ পনর ক্রোশের মধ্যে মনুষ্য ও গ্রাম্যপশুদের জীবন

লইয়া অনেক সময় টানাটানি ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। এ গ্রাম সে গ্রাম করিয়া, যে যে গ্রামে বলিষ্ঠ ও সাহসী লোক ছিল, সকলেই তখনকার ভাল ভাল শিকারীদের নিকট শিকার শিক্ষা করিয়াছিল। তাহার ফল ফলিয়াছিল ভাল, কিন্তু দুর্ব্বল ও ভীরু লোকের সংখ্যা সকল সময়েই অধিক, এবং বলিষ্ঠ ও সাহসীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম; সুতরাং গ্রামবাসীদের প্রাণের ভয় সম্পূর্ণরূপে ঘুচিয়াও ঘুচে নাই।

কোন কোন গ্রামের জমীদার প্রজাগণের ভীতিনিবারণের জন্য পারিতোষিকের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং প্রাচীন ও নূতন শিকারীরা বাঘ মারিয়া বিলক্ষণ দশ টাকার সঙ্গতি করিয়াছিল।

এক দিন পৌষ মাসের ঠিক্ সন্ধ্যার সময় কুড়ি পঁচিশ জন শিকারী নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া, গৌড়ের নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিল। সকলেই একত্র হইয়া, বিশেষ সতর্কতার সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। এমন সময়ে হঠাৎ এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "খুব হুঁসিয়ার, ভাই সকল!

খুব হুঁসিয়ার। ঐ দিকটে থেকে বড্ড বোট্‌কা গন্ধ আস্‌চে।”

আর একজন নাক সিট্‌কাইতে সিট্‌কাইতে বলিল,“হুঁ তাই তো। সকলে বন্দুক ঠিক্ কোরে ধর।”

অনন্তর শিকারীরা একটা দীঘির পাড়ের নিকট উপস্থিত হইল। অনেক কালের দীঘি—অনেক কালের পাড়। দীঘি অনেকটা মজিয়া গিয়াছে—চারিদিকের পাড়ও বৃষ্টির জলে ভিজিয়া ভিজিয়া অনেকটা ক্ষয় পাইয়াছে; তথাপি পাড় যেন ক্ষুদ্র পাহাড়। জানি না, সেই সুবিশালা দীর্ঘিকাটি গৌড়ের কোন্ রাজার কীর্ত্তি। তিনি যিনিই হউন, এত দিনে তাঁর কঠিন হাড় হয় তো মাটি হইয়াছে, কিন্তু তাঁর মাটির পাড় যেন কঠিন হাড় হইয়া, আজিও জাগিয়া আছে। কীর্ত্তির নিয়মই এই,কঠিনকে কোমল করিয়া কোমলকে কঠিন করা।

সশস্ত্র শিকারীরা দীঘির পাড়ের উপর উঠিয়া, কতকগুলা গাছের আড়ালে গোপনে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এ দিক ও দিক করিয়া চাহিয়া দেখিল, কিন্তু শিকার্য্য জীবের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। কিয়ৎ কাল পরে দেখিতে পাইল,

দূরে একটা ব্যাঘ্রী ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহাদের লক্ষ্যপথে আসিয়া দাঁড়াইল, ব্যাঘ্রী কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সে দীঘির পাড়ের একটা গহ্বর হইতে বাহির হইয়া, শিকার জন্য প্রস্তুত হইল। সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া, গ্রামগ্রামান্তরে যাইবার বড় সুবিধা; তাই বাঘিনী এতক্ষণের পর গহ্বর ত্যাগ করিয়া, কোন্ দিকে যাইবে, তাই যেন ভাবিতে লাগিল। বাঘিনী যাইবে গ্রামে মানুষ-শিকারে; এ দিকে বনে মানুষ আসিয়াছে বাঘিনী-শিকারে।

অল্পক্ষণ পরেই রক্তলোলুপা ব্যাঘ্রী চলিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎ দূর গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। দুই চারি বার ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া নাক সিট্কাইল। অমনি ঘ্রাণশক্তির বলে বুঝিতে পারিল, শিকারের জিনিষ কাছে আছে। দেখিতে দেখিতে ব্যাঘ্রীর মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল—ভীষণ মূর্ত্তি ভীষণতর হইল—চক্ষু বিস্ফারিত হইল—তন্মধ্য দিয়া তীব্র জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল—ধীরে ধীরে দীর্ঘ লাঙ্গূল সঞ্চালিত হইতে লাগিল।

এ দিকে শিকারীরা নিশ্চল স্থাণুর ন্যায় দাঁড়া-

হইয়া ছিল। পরে যেমন দেখিল, লক্ষ্য আর ভ্রষ্ট হইবার নহে, অমনি এক জন একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া ইঙ্গিত করিল। যেমন ইঙ্গিত, অমনি এক সঙ্গে সমস্ত বন্দুকের শব্দ ফুটিয়া উঠিল। শব্দ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলন্ত অগ্নি প্রত্যেক বন্দুকের মুখে চমক দিয়াছিল। যেমন বন্দুকের শব্দ, অমনি ব্যাঘ্রী বিকট গর্জ্জন করিয়া ভূমিতে লুটিয়া পড়িল, ছটফট করিতে লাগিল। আবার বন্দুকের শব্দ হইল। ব্যাঘ্রীও নিশ্চল হইয়া রহিল।

অনন্তর শিকারীরা ব্যাঘ্রীর নিকটে গিয়া দেখিল, বন্দুকের গুলিগুলি কাজ সারিয়াছে—বাঘ মারিয়াছে। তার পর পুরস্কারের কথা মনে জাগাতে সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া মৃতা ব্যাঘ্রী উঠাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কএক পদ যাই-বার পর শুনিতে পাইল, যেন নিকটে অথচ কোথায় শিশুর রোদন-শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। বাঘের বনে মানুষের ছেলে কাঁদিতেছে! বড় আশ্চর্য্যের কথা! কাজে কাজে শিকারীরাও চমৎকৃত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইল।

তখন সকলে মৃতা ব্যাঘ্রীকে সেখানে রাখিয়া, শিশুকণ্ঠের শব্দ লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিল। কএক পদ গিয়া বুঝিতে পারিল, দীঘির পাড়ের একটা গহ্বর হইতে সেই শব্দ আসিতেছে। শিকারী-দের কৌতূহল দ্বিগুণতর হইল। দলের ভিতর হইতে এক জন শিকারী বলিল, "বাঘের গর্ত্তে কচি ছেলেই তো কাঁদ্‌চে হে। একবার ঢুকে গিয়ে দেখ্‌লে হয় না?"

আর এক জন বলিল, "যদি বাঘ থাকে, তবে—"

অমনি আর একজন তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "গর্ত্তর মুখে গোটা দুই ফাঁকা আওয়াজ করি। বাঘ থাকে তো বেরুবে। যেমন বেরুবে, অম্নি ছর্‌রা ছাড়্‌বো।"

অপর ব্যক্তি বলিল, "যদি বন্দুকের আওয়াজ শুনেও বাঘ না বেরোয়।"

আর এক জন হাসিয়া উত্তর করিল, "তবে মাটির গর্ত্তে ঢুকে, শেষে বাঘের পেটের গর্ত্তে ঢুক্‌তে হবে।"

তাহারা এইরূপ পরামর্শ করিতেছে, এমন সময়ে গর্ত্তের ভিতর শিশুর রোদনধ্বনি আরও

বাড়িয়া উঠিল। তখন শিকারীদের মধ্য হইতে এক জন লোক বলিয়া উঠিল, "যা থাকে কপালে, চল, গুলিভরা বন্দুক ও অন্যি অন্যি অস্তর ঠিক্ কোরে গর্ত্তের ভিতর ঢুকে পড়ি। আলো জ্বালো।"

তাহাই হইল। শিকারীরা সাহসে ভর করিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিল। ভিতরে ভয়ানক দুর্গন্ধ। এখানে হাড়, ওখানে চামড়া, সেখানে মাথার খুলি ছড়াছড়ি হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের শাড়ী পুরুষের কাপড়, সোণা রূপার দু' পাঁচখানা গহ্-নাও ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। বাঘিনী যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এই সকল চিহ্নই তার প্রমাণ।

দুর্গন্ধের জ্বালায় শিকারীরা নাকে কাপড় চাপিয়া রহিল। দেখিল গর্ত্তের ভিতর বাঘ নাই, কেবল একটি নয় দশ মাসের শিশুকন্যা রহিয়াছে। তারা বাহির হইতে যার কান্না শুনিতে পাইয়াছিল, সেই এই শিশুকন্যা। কন্যাটি কতকগুলা ছেঁড়া কাপড়ের উপর পড়িয়া হাত পা নাড়িতেছে— যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। শিকারীরা তাহাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইল। একজন

কন্যাটিকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিল। যে কয়খানা গহনা পড়িয়াছিল, সেগুলিও তাহারা তুলিয়া লইল। এমন সময়ে একজন বলিল, “আর বিলম্ব কোরে কাজ নি, ভাই! চল, কচি মেয়েটিকে নিয়ে যমের অন্দরমহল থেকে পালাই।”

অনন্তর সকলে মেয়েটিকে লইয়া বাহিরে আসিল। কএক জন মিলিয়া মৃতা ব্যাঘ্রীকে স্কন্ধে উঠাইল, কএকজন আলোক ও অস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল, একজন শিশুকন্যাটিকে কোলে করিয়া রাখিল। ক্রমে ক্রমে সকলে জঙ্গল ছাড়াইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধনেশ্বর সিংহ রায়।

গৌড় জঙ্গলের ছয় ক্রোশ দক্ষিণে একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। গ্রামটির নামটি সাম্টী। সেখানে সকল প্রকার জাতিরই নিবাস ছিল, তবে রজপুতের বাসই বেশী। সেই গ্রামে ধনেশ্বর সিংহ রায় নামে একজন দুরন্ত রজপুত বাস করিত। ধনেশ্বর, এক ধনের লোভে না করিয়াছে এমন কর্ম্ম নাই। জাল জালিযাত, উৎপীড়ন, অত্যাচার, আত্মীয় স্বজনের সহিত মর্ম্মান্তিক বিবাদ প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য পাপকর্ম্ম ধনেশ্বরের অঙ্গভুষণ। টাকাই ধনেশ্বরেব জপমালা। ধার্ম্মিকের জিহ্বা নড়িতে চড়িতে হরি বলে, ধনেশ্বরের জিহ্বা নড়িতে চড়িতে টাকা বলে। যার জিহ্বা টাকা বলিতে এত মজবুৎ, না জানি তাঁর মন টাকার জন্য কি বলে। ধনেশ্বরের পত্নীও তথৈবচ। 'যেমন দেবা, তেম্নি দেবী।' নহিলে উভয়ের মনস্কামনা পূরে কই? ধনেশ্বরের ধনেশ্বরীর পরিচয় এক লাইনে সারিয়া দি

"এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার ?"

প্রভাত হইয়াছে। ধনেশ্বর বাহির বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া বাসিমুখ ধুইতেছে। প্রথমে দাঁতন, দ্বিতীয়ে গলমধ্যে অঙ্গুলিপ্রবেশ, তৃতীয়ে অঙ্গুলি-মর্দ্দনে গর্জ্জন, চতুর্থে ঘন ঘন কুল্লা, পঞ্চমে চক্ষে মুখে জলসিঞ্চন ও ষষ্ঠে মুখাদিমুঞ্জন। এইরূপে বৃহৎ ব্যাপার সমাপ্ত হইল। কিন্তু একটা কথা হইতেছে, এতটা সময়ের মধ্যে ধনেশ্বর কয় বার কার সর্ব্বনাশ করিবার কয়টা উপায় ভাবিয়াছে? ঈশ্বর জানেন।

এমন সময় একজন খানসামা একটা রূপা-বাঁধান হুঁকায় উত্তম অম্বরী-তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। ধনেশ্বর রোয়াকের উপর বেড়াইতে বেড়া-ইতে তামাক টানিতে লাগিল। পায়চারির ভাগে ও হুঁকার টানে বেশ বোধ হইল, ধনেশ্বর কোন সরল ব্যক্তির প্রাণে গরল ঢালিবার যোগাড়ে মনের সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেছে।

এমন সময়ে কতকগুলি লোক আসিয়া উপ-স্থিত। কারা তারা? সেই শিকারীরা। তাহাদের মধ্যে এক জনের ক্রোড়ে সেই ব্যাঘ্রীগহ্বরলব্ধা

শিশুকন্যাটি নড়িতেছিল। এক জন শিকারী ধনেশ্বরকে নমস্কার করিয়া কহিল,

‘বাবু মশাই ! কাল সাঁঝের পর গৌড়ের জঙ্গলে একটা মস্ত মাদী বাঘ শিকের কোরেচি। ও পাড়ার শীতল চাটুয্যে মশাই দশ টাকা আর যদু দত্ত মশাই সাত টাকা আট আনা বক্‌সিস্ দিয়েচেন। এখন আপনকার কাছে বক্‌সিস্ চাই। যেমন তেমন বক্‌সিস্ নয়, এক এক জনে এক এক টাকা নেবো। আপনি মস্ত জমীদার।”

ধনেশ্বর বিরক্ত হইল। বলিল, “তাদের বেশী বাঘের ভয়, তাই বক্‌সিস্ দেয়। আমার কাছে কেন ?”

তখন সেই শিকারী কি ভাবিয়া মনে মনে বলিল, “তা ঠিক্ ! তুমিই তাদের বাঘ। চার পেয়ে বাঘে যা না কোত্তে পারে, তুমি হেন দু পেয়ে বাঘে কত লোকের যে কত সর্ব্বনাশ কোরেচো, তা ভাব্‌লেও শরীর শিউরে উঠে।”

অপর এক জন শিকারী বলিল, “বড় আশা কোরে এসেচি, আপনকার যা খুসি, তাই দিন্।”

ধনে। আমি কি বাঘ মাত্তে হুকুম দিয়ে-

ছিলেম ? মারা বাঘ বেচে নিগে যা। তো ব্যাটারা কি জানিস্ নি, জ্যান্ত রাখ্‌লে কিছু লাভ হয় না, মেরে ফেল্লেই লাভ। বাঘ মেরেচিস, লাভ করেছিস। হাটে গিয়ে ওটার চামড়া, দাঁত, নখ সব বেচে টাকা তুল্‌গে।"

এই কথা শুনিয়া সেই শিকারী মনে মনে বলিল, "তা যথার্থি ; তোমার মত মানুষ বাঘটাকে মাত্তে পাল্লে, অনেক গরীব গুর্ব্বো নোকের নাভ আছে। তোমার হাড় গুঁড়ুলে অনেকের হাড় জুড়োয়।"

সে এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় সদর দরজায় সহসা কোলাহল উঠিল। অমনি ধনেশ্বর শশব্যস্তে মুখের হুঁকা হাতে ঝুলাইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসিল, "দেউড়ীতে কিসের গোল রে ?"

একজন শিকারী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "সত্যি মিথ্যে দেখুন না, মশাই।"

ধনে। সত্যি মিথ্যে কি ?

শি। আপনি মনে ভেবেচো, হয়তো আমরা বাঘ মারিনি ; মিছিমিছি ফাঁকি দিয়ে বক্‌সিস্ যাচ্চি। তা নয়, বাবু মশাই, তা নয়। ঐ দেখ

কত বড় মাদী বাঘ! ল্যাজ তো নয়, যেন বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি।”

শিকারীর কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে বাঘ-বওয়া শিকারীরা ধনেশ্বরের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া, মৃতা শার্দ্দূলীকে ভূতলে শোয়াইল। সামটী গ্রামের স্ত্রী পুরুষ করিয়া অনেক লোক উঠানে জমিয়া গেল। তম্মধ্যে বালক বালিকার ভাগই অনেক বেশী।

একটি ষষ্ঠবর্ষীয় বালক মৃতা ব্যাঘ্রীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইল। তদ্দর্শনে একটি বৃদ্ধা তাহাকে টানিয়া পিছাইয়া লইল। বালক বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিল, “কেন, বুড়ি, আমাকে টান্‌লি?”

বৃদ্ধা। অত কাছে এগিয়ে যাস্ কেন? বাগে পেলে বাঘ জাপ্‌টে ধোরে ঘাড় ভেঙে দেবে যে!

বালক। মরা বাঘে কামড়ায় বুঝি?

বৃদ্ধা। আঁকা মউরে হার গিল্‌তে পারে, মরা বাঘে কাম্‌ড়াতে পারে না?

বুড়ীর এইরূপ যুক্তি শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। আর একটি লোক বুড়ীকে হাসিতে হাসিতে

বলিল, "ওগো, মরা বাঘের কিছুই পদার্থ নেই।"

বুড়ী চটিয়া উঠিল, বলিল, "নেই তো মরা হাতী নাক টাকা বলে কেন?"

এ দিকে বুড়ীর সঙ্গে এইরূপ তর্কবিতর্ক চলিতেছে; ওদিকে কতকগুলো ছেলে নূতন তর্কে মাতিয়াছে। কেহ বলিতেছে, "বাঘের পেট তো খুব হাঁড়োল পানা নয়, ভাই! তবে মানুষ গরু কোথায় ধরে?"

কেহ বলিতেছে, "বাঘের পেটে জাঁতাকল আছে। তাইতে হাড় গোড় পিশে ফেলে!"

কেহ বলিতেছে, "আমাদের মেনী বেরালটা কি এর ছেনা? ঠিক, ভাই, তার মত দেক্তে না?"

কেহ বলিতেছে, "তা কেন, রে ভাই? বেরাল যে বাঘের মাসী। এই বাঘটাই মেনীর বোন্‌ঝী।"

কেহ বলিতেছে, "তাও কি হতে পারে? ছোট বেরালের পেটে এত বড় বাঘ জন্মায় কি?"

কেহ বলিতেছে, "কেন জন্মাবে না? একটা মটরের মত মাকড়শার পেট থেকে যে কালে থালার মত সূতোর জাল বেরুতে পারে, সে কালে মেনীর পেট থেকে এত বড় বাঘও বেরুতে পারে।"

যার যা মনে আসিতেছে, সে তাই বলিতেছে। এইরূপে ব্যাঘ্রীবর্ণন চলিতে লাগিল।

উঠানময় ভিড় দেখিয়া ধনেশ্বর বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "ওরে শিকারীরে! যা, মরা বাঘ বাড়ী থেকে বা'র কোরে নিয়ে যা।"

এক জন শিকারী বলিল, "দয়া কোরে কিছু বক্সিস্ পেলেই নিয়ে যাই, বাবু মশাই!"

ধনে। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া) আবার সেই কথা? তামাসা পেয়েচিস্ কি রে ব্যাটারা? (দেহুড়ীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এই মাধো সিং! এই হনুমান্ দুবে! জল্‌দি এ লোক্‌কো নিকাল দেও।"

ধনেশ্বরের এই মধুর ধ্বনিতে উঠানভরা লোক ব্যস্ত হইয়া বাহির হইতে লাগিল। সেই সময়ে, যে শিকারী লোকটির ক্রোড়ে সেই শিশুকন্যাটি ছিল তাহার গায়ে একজন লোকের ধাক্কা লাগিল। আচম্‌কা ধাক্কা লাগাতে ক্রোড় হইতে কন্যাটি ভূতলে পড়িয়া গেল। আঘাত লাগিল; কন্যা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। লোকটি তাড়াতাড়ি কন্যাটিকে পুনর্ব্বার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনা

করিতে লাগিল। ধনেশ্বর স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াও দেখিল না, একটু কষ্টবোধও করিল না। ধনেশ্বরের হৃদয়, বোধ হয়, জীবদান পাওয়া পাষাণ।

আরও একজন দেখিল। সে কে? ধনেশ্বরের পত্নী ভামিনী। বাড়ীর আর কয়জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে দোতালার জানালায় দাঁড়াইয়া ভামিনীও বাঘিনী দেখিতেছিল। সে তখন একজন দাসীকে বলিল, "রাখালের মা! শীগ্‌গির গিয়ে কর্ত্তাকে বল্‌, যেন মেয়ে-কোলে লোকটি বেরিয়ে না যায়। আহা, কচি মেয়ে! পোড়ে গিয়ে বড্ড আঘাত পেয়েচে। মরি মরি, দিব্যি মেয়েটি। যা শীগগির যা।"

রাখালের মা কর্ত্তার নিকট আসিল। গিন্নীর সমস্ত কথা বলিল। গিন্নীর হুকুম রদ করে, কর্ত্তার সাধ্য কি? হুকুম তামিল হইল। কন্যাটিকে লইয়া শিকারী দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, "আমার কপালে কিছু নাচলো বুঝি। ভাগ্যে মেয়েটা পোড়ে গিয়েছিল।"

দর্শকেরা চলিয়া গেল। অপর শিকারীরা মরা বাঘ ঘাড়ে তুলিয়া সদর দরজার বাহির হইল। যাই-

বার সময় দুই চারি জন শিকারী সেই শিকারীকে চুপু চুপু বলিয়া গেল, "তিন চার-মোণ বাঘ বোয়ে তো সিংহির কাছে নবডঙ্কা পেলুম। তুই সের দুই আড়াই মেয়ে বোয়ে কিছু মাল মার্‌লি দেখ্‌চি। যাই পাস্‌, কিছু আমাদেরো দিস্‌, ভাই!"

সে বলিল, "মেয়েটির দুদের কড়ির যো রেখে তবে তো।"

"আচ্ছা, আচ্ছা" বলিয়া অরা চলিয়া গেল।

বাড়ীর ভিতর হইতে আবার আর একজন দাসী আসিল। ধনেশ্বরকে বলিল, "মা ঠাক্‌রুণ বোল্লেন, আপুনি এই মেয়ে কোলে নোকটিকে নিয়ে বাড়ীর ভিতর একবার আসুন।"

ধনে। কেন?

দাসী। তা জানি নি।

ধনে। (কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া, শিকারীর প্রতি) ওরে, আমার সঙ্গে আয়।

শিকারী। যে এজ্ঞে।

অগ্রে ধনেশ্বর, পশ্চাৎ দুই জন দাসী ও শিশু কন্যাটি লইয়া শিকারী অন্দরমহলে গিন্নীর নিকট গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিলাপ ও সান্ত্বনা।

কপিলপুর গ্রামের পূর্ব্ব দিকের সীমায় কাছাকাছি সাত আটখানি সামান্য রকমের খোড়ো ঘর ছিল। তারই একটি ঘরে কোন দরিদ্র দম্পতি বাস করিত। স্বামীর নাম ভীম ভাম ও পত্নীর নাম দ্রবময়ী। দরিদ্রতা যেন তাহাদের সঙ্গের সাথী হইয়াছিল। ঘর দেখিলে, অবস্থা দেখিলে, তাহারা যে নিতান্ত বিপন্ন, তার আর কোন সন্দেহ থাকিত না। ভীম ভাম খাটিয়া খুটিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিত, দ্রবময়ী তাহাই রন্ধনাদি করিয়া স্বামীকে খাইতে দিত। দুঃখকে সুখ জ্ঞান করিয়াও উভয়ে একপ্রকার কালযাপন করিত। কিন্তু আজ কয় দিন ধরিয়া, তারা নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। তাদের যেন কি একটি প্রাণের জিনিষ হারাইয়াছে। সুখ নাই, সোয়াস্তি নাই— দ্রবময়ী কেবল কাঁদে! উৎসাহ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই— ভীম ভাম কেবল ভাবে। কুটীর নিরানন্দ। তাতে—

আবার কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। দম্পতি-হৃদয়ের সহিত প্রকৃতির হৃদয়ও অন্ধকার।

ভীম ভাম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আর কেঁদে কি কোর্‌বে বল ? 'যা হবার, তাই হয়' এ কথা তো তুমি আমাকে কত বারই বোলেচো। তবে আর এখন নিজে কেন সে কথা পালন কোচ্চো না ? কেঁদো না, চুপ কর।"

দ্রবময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো, মনে করি, কাঁদ্‌বো না, কিন্তু সেই মুখখানি মনে পোড়্‌লে চক্ষের জল যে আপনি উথ্‌লে পড়ে। সবেমাত্র সেইটিই আশা ভরসা ছিল, তাও পোড়া কপালে সইল না। আজ এগার দিন হ'ল, বাছা আমার কোথায় গেলো! আর কি তাকে পাবো! বাঘের মুখে পোড়্‌লে জোয়ান মানুষই বাঁচে না; তা অমন কচি মেয়ে। মাকে আমার তখনি সব্বনেশে বাঘ টিপে মেরে খেয়ে ফেলেচে! হায় হায়! তুমিও যদি সে রাত্রে ঘরে থাক্‌তে, তা হ'লেও বাছা আমার হয় তো— এই পর্য্যন্ত বলিয়াই দ্রবময়ী আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। চক্ষের জলে মলিন বসন ভিজিয়া গেল।

ভীম ভাম ললাটে হস্ত চাপিয়া অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিল। ভাবনা ক্রমে গাঢ় হইল। চক্ষু-যুগল হইতে কয় বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। নাসা হইতে আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ হইল।

শোকময়ী দ্রবময়ী মুখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতেছিল। সহসা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনিল। বুঝিতে পারিল, তার স্বামীর এই শোকনিশ্বাস। সে নিজে শোককাতরা, তথাপি শোককাতর স্বামীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। সে দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব! যেন কণ্টকে গোলাপ!

এইরূপে পরস্পরের বিলাপে ও সান্ত্বনায় কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেল।

এমন সময়ে কে বাহির হইতে ডাকিল, "বড় কর্ত্তা ঘরে আছ?"

ভীম ভাম বুঝিতে পারিল, কণ্ঠ পরিচিত। গৃহ হইতে উত্তর করিল, "দাঁড়াও, যাচ্চি হে।" এই বলিয়া বাহিরে গেল। আগত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে কাছে সরিয়া গিয়া ধীর স্বরে জিজ্ঞাসিল, "আজ ক' দিন ধোরে যাও নি কেন? অসুখ টসুক হয়েচে কি?"

ভীম ভাম দুঃখের সহিত ধীরস্বরে বলিল, "পাঁচু রে, এমন অসুখ যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়।"

আগন্তুক লোকটির নাম পাঁচু। সে ভীম ভামের মুখে সহসা এই কথা শুনিয়া চঞ্চল হইয়া ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "ব্যাপার কি?"

ভীম ভাম সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। পাঁচু শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। বলিল, "আহা, তাই তো! আর তোমাদের ছেলেপিলে নেই, কেবল সেই মেয়েটিই সম্বল হয়েছিল। তাও ভগবান্ বাঘের পেটে দিলে!" এই বলিয়া সে নীরব হইয়া দণ্ডায়মান রহিল।

অনন্তর ভীম ভাম বলিল, "কোন বিশেষ দরকার পোড়েচে কি?"

পাঁচু। তা নয়, তবে তোমার এত দিন বিলম্ব দেখে গেজো কর্ত্তা আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

ভীম। তা বটে, আজ দশ দিন উপরি উপরি যাই নি। যাই বা কেমন কোরে। তা যাক্, তুই গিয়ে স্বরূপকে বল্, পরশু তরশু নাগাদ আমি যাব।

পাঁচু চলিয়া গেল। ভীম ভামও পুনর্ব্বার পর্ণ-কুটীরে প্রবেশ করিল।

এখন পাঠক মহাশয় ও পাঠিকা মহাশয়ার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। তাঁরা হয় তো ভাবিতেছেন, এত নাম থাকিতে এ আবার কি নাম—ভীম ভাম? ভাবিবার কথা বটে। যাঁহাদের কর্ণকুহররূপ পানের খিলিটি যামিনী, কামিনী, নলিনী, ক্ষীরোদ, নীরদ, প্রভৃতি নামরূপ মৌরী, ধনের চাল, কর্পূর, এলাইচ প্রভৃতি মসলায় ভরিয়া আছে, সে খিলিতে কোথা হইতে জাহাজে কষা সুপারি আসিল—ভীম ভাম!

তা আমি কি করিব। কষা সুপারি বুঝিয়া চিবাইলে বেশ রসা হয়। এলাচ, কর্পূর হারি মানে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্যথার ব্যথী।

রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু ভীম ভাম ও দ্রবময়ীর শোকরজনীর প্রভাত হইল না। পল্লীর দুই এক জন প্রতিবাসী আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিত। আজিও আসিল। আচ্ছা, দুই এক জন এই বিপদের সময় কেন আসে? বেশী আসে না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর যাহাকে জিজ্ঞাসিবে, সেই দিবে। ধনীকে জিজ্ঞাসা কর, ঠিক্ উত্তর পাইবে;—দরিদ্রকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাই পাইবে। ঠিক উত্তরটা কিরূপ? টাকা।

তবে কি টাকাই বড়? ধর্ম্ম বড় নয়? না না, তা কেন? ধর্ম্মই বড়, টাকা কিছুই নয়। যারা ধর্ম্মভয় করে, তারা নরাকারে দেবতা; যারা টাকায় টান রাখে, তারা নরাকারে নরকের ভূত! আজ যদি ভীম ভামের টাকার জোর থাকিত, তা হ'লে দেখিতে নিজ গ্রাম তো দূরের কথা, কত ভিন্ন গ্রাম হইতে সান্ত্বনাকারী ও সান্ত্বনাকারিণীর আমদানী

হইত! কত বন্ধু, মিত্র, সুহৃদ, সখা দেখা করিতে ছুটিত! কত আত্মীয় স্বজন চক্ষের জল মুছিত! কিন্তু তা তো হইবার নয়। ধর্ম্মভয় ও কর্ত্তব্যজ্ঞান ক' জনের আছে? তুমি মর, উচ্ছন্ন যাও, পথের ভিখারী হও, তাতে আসে যায় কি? নরকের ভূতদের টাকা চাই। তাই প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন, "অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ।"—অর্থেই সবাই বশ। টাকা ঢালিলে তোমার ব্যথার ব্যথী পাইবে—সুহৃদ, সখা, বন্ধু, বান্ধব পাইবে—কত কি পাইবে। আর যেই তোমার টাকা বন্ধ হইল, অমনি যারা তোমার মাথায় তুলিয়া নাচিত, তারাই পরম শত্রু হইবে—তোমার গলায় ছুরী বসাইবে—জেলে দিবে—গালি দিবে—উচ্ছন্ন দিবে—পিত্তি দিবে। নহিলে এই দরিদ্র দম্পতির এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন?

দুই এক জন লোক ভীম ভাম ও দ্রবময়ীকে সান্ত্বনা করিতে আসিত, এ কথা আগেই বলিয়াছি। সেই দুই এক জন লোক যে পরদুঃখকাতর এবং তাদের প্রাণ যে ব্যথীর ব্যথা বুঝিতে অগ্রসর,

তা আর বলিতে হইবে না। অদ্য যে লোকটি আসিয়াছে, সেও তাই। এ লোকটি পুরুষ নহে, স্ত্রী। স্ত্রীলোকের হৃদয় পুরুষের অপেক্ষা কোমল। বিশেষতঃ অপত্যস্নেহে একটি নারীহৃদয় এত মহান্ যে, শত শত নরহৃদয় তাহার সহিত তুলিত হইতে পারে না। এই স্ত্রীলোকটির বয়স অনূ্যন বত্রিশ বৎসর। প্রৌঢ়ত্বের প্রথম অবস্থা; মস্তকে কাঁচা গোছা চুল; বর্ণ গৌর; দেহ নাতিস্থূল নাতিকৃশ; বিধবা; নাম মহামায়া।

দ্রবময়ী মহামায়াকে বসিবার পীঁড়ি দিয়া বসিতে বলিল। মহামায়া বসিল। বসিয়া জিজ্ঞাসিল, "তোমার স্বোয়ামী কোথা গেলো? আমি দেখে এলেম মনসাতলার দিক দিয়ে বরাবর কোথা যাচ্চে।"

দ্রব। নাইতে।

মহা। নাইতে?

দ্রব। হ্যাঁ, দিদি!

এই কথা শুনিয়া মহামায়া সদুঃখে বলিল, "আহা, রুখুই নাইতে গেলো গা!"

ধ্রুব। (সবিষাদে) যেমন কপাল, দিদি! আমাদের থাকৃতেও নেই। যদি তাও সয়ে থেকে মেয়েটিকে নিয়ে এক রকম কোরে দিন কাটাচ্ছিলেম, তাতেও শেষে বিধেতা বিমুখ হোলো। আর জন্মে অনেক পাপ করেছি তাই আমার দুঃখুর উপর দুঃখু। কত দিনে যে, দিদি, আমার মরণ হবে, এখন তাই কেবল দিনরাত ভাবৃচি।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ধ্রুবময়ী কাঁদিতে লাগিল।

মহামায়া সান্ত্বনাসূচক বচনে বলিল, "হরিকে ডাক, বোন্! তিনিই বিপন্নের একমাত্র ভরসা। দের্‌বা! চিরদিন সমান যায় না। আজ সুখ, কাল দুখ; আজ হাসি, কাল কান্না। আবার কাল ফের সব ফিরে যায়। আমরা তো সামান্যি মানুষ বৈ তো নয়। অমন যে রাজা রামচন্দর, অমন যে রাজা যুধিষ্টির, অমন যে রাজা নল, অমন যে রামের সীতে, অমন যে যুধিষ্টিরের দ্রৌপদী, অমন যে নলের দময়ন্তী, তাঁদেরো এক সময় কত কষ্ট ভুগ্‌তে হয়েছিল। কিন্তু শেষে আবার কত সুখ হয়েছিল।"

ধ্রুবময়ী ম্লানমুখে বলিল, "তা বটে, দিদি!

কিন্তু, যত দিন যাচ্ছে, ততই হতাশ হচ্চি। আমাদের দুঃখু ঘোচবার নয়।”

মহা। রেতের পর যদি দিন আর না আসে, তবে বল্‌তে পারি যে, দুঃখুর পর সুখও আর আস্‌বে না। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে সবই ঠিক্।”

মহামায়া এই পর্য্যন্ত বলিয়া একখানি কাপড়ের ফালিতে বাঁধা সের খানেক চিড়া, আধ সেরটাক মুড়্‌কি এবং খানিকটে তিলকুটা সন্দেশ লইয়া দ্রবময়ী কে বলিল, “এইগুলি রেখে দাও, বোন্! তোমার সোয়ামী নেয়ে এলে খেতে দিও। তুমিও খেও।”

দ্রবময়ী কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সহিত মহামায়ার প্রদত্ত আহার্য্য গ্রহণ করিল। বলিল, “দিদি! এই নিরাশ্রয় পুরে তুমিই আমাদের বড় আপনার। এত দয়া আমি প্রায় আর কারও দেখি নি। আজ এক বছর চার মাস হ'ল, আমরা তোমাদের গাঁয়ে এসে বাস কচ্চি। তখন খুঁকী আমার পেটে। দিদি! বল্‌বো কি, কেউই এখেনে আত্মিস্বজন নেই যে আমাদের দুটো মুখের কথাও কয়। ভাগ্যে তুমি ছিলে, তাই রক্ষে।”

মহা। হ্যাঁ, দেব্‌বো! কত দিন তোমায় জিজ্ঞেস কোরেচি, কিন্তু তুমি একটি দিনও তোমাদের কথা খুলে বোল্লে না। তোমরা কারা? কেন এ গাঁয়ে এসে বাস কচ্চো?

দ্রবময়ী বলিল, "দিদি! স্বোয়ামীর নিষেধ, আমারো বোল্‌তে ইচ্ছে নেই। সময়ে সকলি জান্তে পার্‌বে।"

মহা। আচ্ছা। তবে এখন আসি।

এই বলিয়া মহামায়া চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দরিদ্র দম্পতির মনের কথা।

নির্দ্দিষ্ট দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীম ভাম দ্রবময়ীকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, এখন আমি চল্লেম। আজ আর বিলম্ব হবে না। সন্ধ্যের আগেই ফির্‌বো।"

দ্রবময়ী পতির বাক্য শ্রবণে আগ্রহের সহিত বলিল, "না না, আজ আর কোথাও যেয়ো না।"

ভীম। খরচপত্র নেই, কিছু যোগাড় কোরে আনি।

দ্রব। মহামায়ার মায়া তো আছে।

ভীম। বাস্তবিক; মহামায়া আমাদের প্রতি বড় দয়াবতী। তার নিজের অবস্থা তত ভাল নয়, তবু আমাদের চাল, ডাল, খাবার দাবার যখন তখনই দিচ্চে। বোল্‌তে কি, মহামায়া যেন সাক্ষাৎ মহামায়া অন্নপূর্ণা।

দ্রবময়ী এই কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিল, "আহা, এমন দয়াময়ী মেয়ে আমি কখন

দেখি নি। সে রাক্ষুসী যদি মহামায়ার গুণের তিলটুকুও পেত, তা হোলে কি তোমাকে আমাকে আজ এত অসহ্যি যন্ত্রণা——"

কথা শেষ হইবার অগ্রেই ভীম ভাম বিরক্ত হইয়া বলিল, "থাক্, তাদের নাম পর্য্যন্তও আর উচ্চারণ কোরো না।" এই বলিয়া ভীম ভাম আবার বলিল, "আর বিলম্ব কর্‌বো না, এখন যাই। বেলা বেড়ে যাচ্চে।"

ধ্রুব। আবার সেই কথা ?

ভীম। তা বটে ; কিন্তু মহামায়াকে বারম্বার বিরক্ত করা উচিত নয়। নিজে কিছু যোগাড় টোগার কোরে আনি। যদি কখন দিন পাই, তবে মহামায়ার ঋণ সহস্র গুণে শুধবো।

ধ্রুব। হরি আমাদের সেই শুভদিন শীগগির দিন্।

ভীম। আমিও সেই শুভদিন দেখ্‌বার চেষ্টায় আছি।

ধ্রুব। কি চেষ্টা ?

ভীম। এখন বোল্‌বো না ; পরে জানতে পার্‌বে।

দ্রবময়ী আর কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার স্বামী যেরূপ ভাবের কথা কহিল, তাহাতে সে কথা জানিতে কাহার না কৌতূহল হয়? তা হইলে হইবে কি, ভীম ভামের নিষেধ আছে যে, সে যদি কোন কথা বলিতে না ইচ্ছা করে, কাহার সাধ্য তাহাকে তা বলায়। দ্রবময়ী সেটা বিশেষরূপে জানিত, সুতরাং কিছুই বলিল না। সে কথা ছাড়িয়া দ্রবময়ী এই কথা বলিল, "তবে যাও, কিন্তু খুব শীগ্‌গির ফিরে এস। আমি এখন মহামায়া দিদির বাড়ী যাই।"

অনন্তর উভয়ে উভয়ের গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল। ভীম ভাম অগ্রে চলিয়া গেল। পশ্চাৎ দ্রবময়ী কুটীরদ্বারে তালা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল।

দূরস্থলে যাইতে হইলে ভীম ভাম একটা শক্ত বাঁশের লাঠী সঙ্গে রাখিত। এক্ষণে সে সেই লাঠী লইয়া, "জয় মা কালি!" বলিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে কপিলপুর গ্রাম ছাড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভগ্ন মস্‌জিদে।

কোন্ সময়ে আমাদের বর্ণিত উপন্যাসের ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, পাঠকপাঠিকাগণকে তাহা বলিয়া রাখা উচিত। যখন বঙ্গদেশে একদিকে মুসলমান রাজত্বের অবসান এবং অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত, ইহা সেই অরাজক সময়ের ঘটনা। রাজপরিবর্ত্তনের সময় রাজ্যের যে কি এক শোচনীয় অবস্থা ঘটে, তা যাঁরা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, বিশেষরূপে অবগত আছেন। পুরাতন রাজা হৃতরাজ্য, সুতরাং তাঁহার কিছুই ক্ষমতা থাকে না, এবং নূতন রাজা হঠাৎ লব্ধরাজ্য, সুতরাং পাকা আইন কানুন, পাকা বন্দোবস্ত কিছুই তাড়াতাড়ি ঠিক করিতে পারেন না। এই জন্যই অরাজকের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, অগ্নিসংযুক্ত বারুদের ন্যায় অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া রাজ্য ছারখার করিয়া ফেলে।

অরাজকের সময় অন্যান্য অত্যাচারের সহিত

ডাকাতিটাও অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। ডাকাতকে তখন কে শাসন করে? কাজেই প্রজারা সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া কষ্টেস্থষ্টে কালযাপন করে। এই পুস্তকের ঘটনাটিরও মূলভিত্তি ডাকাতির উপর।

সেই অরাজক সময়ে, কোথাও জঙ্গলে, কোথাও পাহাড়ে, কোথাও জঙ্গলাবৃত ভগ্ন অট্টালিকা প্রভৃতিতে ডাকাতদের গুপ্ত আড্ডা ছিল। ডাকাতেরা দিবসে তত্তৎ স্থানে লুকাইয়া থাকিত; রাত্রে দলবলে সজ্জিত হইয়া গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া ধনী, মধ্যবিত্ত প্রজাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। এইরূপ অরাজকী ডাকাতি বার তের বৎসর প্রবল ছিল।

ডাকাতের অনেক আড্ডা। এই স্থলে একটি আড্ডার কথা বলিতেছি। কপিলপুর হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র নদী। সেই নদীর তীরে প্রায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপী একটা নিবিড় অরণ্য। নানাবিধ বৃক্ষলতারূপ সন্তানসন্ততি লইয়া অরণ্যটা নদীতটে অবস্থিত ছিল। সেই অরণ্যের মধ্যে একটি বৃহৎ মসজিদ্ ছিল। অনেক দিনের মস্‌জিদ্, সুতরাং কালের কুঠারে তাহার

অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছিল। কালের কুঠারাঘাত নিবারণের নিমিত্ত অনেকগুলি বট অশ্বত্থ বৃক্ষ মসজিদের দেহ মস্তক, শিকড়ে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। তাহারা যেন মসজিদ্‌কে বলিয়াছিল, "ভয় কি, ভাই, আমাদের শিকড়রূপ হস্তের মধ্যে তুমি আত্মসমর্পণ কর, কাল তোমার তিলপ্রমাণ ক্ষতিও করিতে পারিবে না।" তাহাদের আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, মসজিদ্ তাদের শিকড়ে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু, কি পরিতাপের বিষয়, যে সকল অশ্বত্থ বট মসজিদ্‌কে কালকুঠার হইতে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারাই শেষে পাকের উপর পাক দিয়া বেচারার ইষ্টকরূপ পাঁজরাগুলি এক এক খানি করিয়া খসাইয়া লইয়াছিল। যাহারা বলিয়াছিল, 'কাল তোমার তিলপ্রমাণ ক্ষতিও করিতে পারিবে না', তাহারাই শেষে সেই বিপন্ন মসজিদের তালপ্রমাণ সর্ব্বনাশ করিল! আহা, এই মসজিদের ন্যায় বিপন্ন মানুষেরাও, দুষ্টবুদ্ধি অশ্বত্থ বটের ন্যায় কুটিল স্বার্থপর নরপিশাচদের দ্বারা কত কষ্টই ভুগিতেছে—কতই কাঁদিতেছে!

সেই মুমূর্ষু দশাপন্ন মস্‌জিদের মধ্যপ্রকোষ্ঠে পঞ্চাশ ষাট জন লোক বসিয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। কেহ বক্তা, কেহ শ্রোতা, কেহ বা শ্রোতা বক্তার মধ্যস্থ। একে একটি মাত্র বৈঠক (বসিবার স্থান), তাহাতে এতগুলি লোকের জমায়েৎ, সুতরাং আলাপের মধ্যে বিশৃঙ্খলতার প্রলাপও ঘটিতেছিল। সেই পঞ্চাশ ষাটটি লোককে দেখিলে সহজ লোক বলিয়া বিশ্বাস হইত না। আকার প্রকারে তাহারা বেকার যে, তাহাও নহে। কোন এক প্রকার দুঃসাহসের কার্য্যে তাহাদের হস্ত পদ মন বুদ্ধি বল সমস্তই নিযুক্ত ছিল। সে দুঃসাহসের কার্য্যটা কি? ডাকাত।

তবে সেই লোকগুলা ডাকাত? তার আর সন্দেহ? সেই ডকাতদের মধ্যে ইতর জাতির সংখ্যাই অধিক; দুই তিন জন ব্রাহ্মণও ছিল। ভিতরে তাহারা একখানা খেজুর চাটাই বিছাইয়া বসিয়া গল্প করিতেছিল। কেহ থেলো হুঁকায় গুড়ুক টানিতেছিল। কেহ চক্‌মকি ঠুকিয়া গুড়ুক-জীবনের সোলা ধরাইতেছিল। গুড়ুকের জীবন কি? অগ্নি। আচ্ছা তাই যদি হইল, তবে অগ্নি-

তেই আবার গুড়ক মরে কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ—যাতে উৎপত্তি, তাতেই নিবৃত্তি। একটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, এই অতি সহজ অথচ অতি শক্ত কথাটা বুঝাইয়া দি। যথা,—যে বাঙ্গালি ষড়যন্ত্র করিয়া সুখের কামনায় ইংরেজের হস্তে নবাব সিরাজুদ্দৌল্লার রাজ্যটা ফেলিয়া দিয়াছিল, সেই বাঙ্গালি এখন ইংরেজের জুতার তলায় পড়িয়া অশেষ প্রকারে দুঃখভোগ করিতেছে।

তাৎপর্য্য।—এখানে ইংরেজের হস্তে বাঙ্গালির আশার উৎপত্তি, আবার ইংরেজের হস্তেই নিবৃত্তি। যথা পূর্ব্বোক্ত গুড়কাগ্নিসংবাদ।

ভীম ভাম বরাবর জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া সেই মস্‌জিদে আসিয়া উপস্থিত হইল। মস্‌জিদের বাহিরে ইতস্ততঃ কএক জন লোক দাঁড়াইয়াছিল; তাহাদের সহিত ভীম ভামের সাক্ষাৎ ও আগত স্বাগত প্রশ্নাদি হইল। বাহিরে তাহারা কাহারা? দস্যুপ্রহরী। এ বড় বিচিত্র কথা! ধনীও প্রহরী রাখে, দস্যুও প্রহরী রাখে। এরূপ হইবার অর্থ কি? অর্থ ও অনর্থ।

অনন্তর ভীম ভাম মস্‌জিদ্‌মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

উপবিষ্ট লোকেরা সানন্দে গাত্রোত্থান করিয়া, ভীম ভামের সবিশেষ সমাদর ও অভ্যর্থনা করিল। এক মুখের সহিত অনেকগুলি মুখের বাগ্‌ব্যবহার চলিতে লাগিল। অন্যাপেক্ষা অল্পবয়স্ক এক জন ডাকাত ভীম ভামকে নূতন গুড়ুক তৈয়ার করিয়া দিল। ভীম ভাম তামাক টানিতে টানিতে, ধূঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে, কথা কহিতে কহিতে, কিয়ৎ কাল অতিবাহিত করিল।

পাঁচুর মুখে পূর্ব্বেই স্বরূপের নাম ব্যক্ত হইয়াছে। ভীম ভাম দস্যুমণ্ডলীর প্রধান দলপতি, স্বরূপচাঁদ সহকারী দলপতি। ভীম ভাম যখন উপস্থিত না থাকিত, স্বরূপচাঁদ তখন দলের কার্য্য সমাধা করিত।

অনন্তর কি কি নিগূঢ় কথা বলিবার জন্য স্বরূপচাঁদকে লইয়া ভীম ভাম মস্‌জিদ্ হইতে বহির্গত হইল। মস্‌জিদের কিঞ্চিৎ দূরে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একটি আরণ্যকুঞ্জ ছিল। ছোট বড় বৃক্ষগুলি তার খুঁটি এবং সপত্রপুষ্পা লতিকাগুলি তার চালা বা ছাউনী। উপরে রৌদ্র, নীচে ছায়া। মাঝে মাঝে ফাঁকের ভিতর দিয়া রৌদ্রের টুক্‌রা নামিয়া

তলস্থা ছায়ার সঙ্গে কায়া হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতে-ছিল। যেন দুঃখে সুখে জড়াজড়ি। সেই নির্জ্জন কুঞ্জটির মধ্যে উভয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ত্তিত বৃক্ষ-কাণ্ডের আসনোপরি পা ঝুলাইয়া বসিল। উভয়ে অতি গোপনীয় পরামর্শ করিতে লাগিল। ছাউনী লতার পার্শ্ব ভেদ করিয়া এক টুক্‌রা রৌদ্র আসিয়া, ঠিক্ ভীম ভামের ওষ্ঠপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। ভীম ভামের ওষ্ঠবিনির্গত অনুচ্চভাষিত গুপ্ত কথা শুনি-বার জন্যই যেন সেই রৌদ্র টুক্‌রাটি এক-বার তাহার গালে, একবার গোঁফে, একবার দাড়িতে, একবার ওষ্ঠে, একবার বা নাসাগ্রে নড়িয়া চড়িয়া বসিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রূপ ও গুণ।

ভীম ভাম দেখিতে সুশ্রী পুরুষ, কিন্তু দারিদ্র্যের চরম সীমায় আসিয়া রূপের অনেকটা বিরূপতা ঘটিয়াছিল। অঙ্গ ও কেশগুচ্ছ তৈলাভাবে রুক্ষ; বস্ত্র ও উত্তরীয় অর্থাভাবে মলিন; অর্থের অভাবে মুখমণ্ডলে বিষাদ-ছায়া। তথাপি ভীম ভাম সুশ্রী পুরুষ। যেন মেঘের অন্তরালে মধ্যাহ্ন-ভাস্কর। ভীম ভামের বয়ঃক্রম অন্যূন পঁয়ত্রিশ বৎসর। শরীরের গঠন বলিষ্ঠ; তবে উপযুক্ত আহারাভাবে কিঞ্চিৎ বলহানি হইয়াছিল। ভীম ভামের বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল বর্ত্তুলাকার ও নিটোল, কটিদেশ ক্ষীণ, উদরপ্রদেশ অনতিস্ফীত, গ্রীবা কঠিন, ললাটপট্ট প্রশস্ত, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুগুম্ফ-পরিশোভিত, নাসিকা দীর্ঘোচ্চ, চক্ষুযুগল মধ্যমাকার ও জ্যোতিঃপূর্ণ। কিন্তু সেই জ্যোতি যেন অনেক দিন ধরিয়া কি একটা অতি নিগূঢ় লক্ষ্যের দিকে সর্ব্বদাই ধাবিত ও আবদ্ধ। আর একটা

কথা, ভীম ভাম কে? যখন আসিয়া ডাকাতের দলে মিশিল, তখন ডাকাত।

আর স্বরূপ? সেও ডাকাত। স্বরূপ দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। আকার নাতিদীর্ঘ, গঠন বলিষ্ঠ, কেশগুচ্ছ দীর্ঘ ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বিত, ওষ্ঠাধর কিঞ্চিৎ স্থূল, চিবুক কতকটা চাপা, চক্ষু দুটি ছোট, গলায় মালা, ডান হাতে একগাছা রূপার তাগা। বয়সে ভীম ভামের অপেক্ষা দুই চারি বৎসর বড়।

এই তো গেল রূপের কথা। এই বার গুণের কথা।

ভীম ভাম আরণ্য তরুলতার কুঞ্জে বসিয়া জিজ্ঞাসিল, "স্বরূপ! এ কয় দিনের মধ্যে দলে তো দলাদলি গঠে নি?"

স্বরূপ ঘাড় চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে উত্তর করিল, "তোমার ভাল বন্দোবস্তে দলাদলি ঘটে নি, তবে কি না টাকার বড় টানাটানি ঘটেচে। সেই জন্যে সকলে কিছু অসুখী।"

এই কথা শুনিয়া ভীম ভাম বিমর্ষচিত্তে বলিল, "তা তো হবারই কথা। খেতে পোর্‌তে কষ্ট

হ'লে, মানুষের অসুখ তো সঙ্গের সাথী।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরবে কি ভাবিতে লাগিল। দক্ষিণ বাহু উরুর উপর স্থাপিত এবং বাম বাহুর অঙ্গুলিগুলি কপালের সম্মুখস্থ চুলগুলির মধ্য দিয়া যাওয়া আসা করিতে লাগিল। স্বরূপ নীরবে পার্শ্বভাগ হইতে হাত বাড়াইয়া, লতা হইতে একটা পাতা ছিঁড়িয়া লইল। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে পাতাটির বোঁটা ধরিয়া, ঘুরাইতে ঘুরাইতে দেখিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভীম ভাম চক্ষু মেলিয়া বলিল, “দেখ, স্বরূপ! সেই ভাঙা বাড়ীটের মাটীর নীচে যে এক কলসী আর দুই ভাঁড় টাকা পাওয়া গিয়েছিল, তার আর কিছুই নেই?

স্বরূপ। একটি টাকাও নেই। থাক্‌বেই বা কেমন কোরে? কম্‌বেশ চল্লিশ জন লোক সেই টাকাতেই দিন গুজ্‌রোন্ কোচ্চে। তুমি আমি তো অতি কষ্টেই আধপেটা খেয়ে কাল কাটাচ্চি।

ভীম। তোমার আমার আধপেটাই হোক্ আর নাই হোক্, কিন্তু অপর লোকদের তো চোল্‌বে না। এখন উপায় করি কি?

স্বরূপ। তুমি একবার মুখ ফুটে হুকুম দিলেই তারা দু এক জায়গায় ডাকাতি কোত্তে বেরুতে পারে।

ভীম। না, স্বরূপ, তা পার্‌বো না। তোমরা যখন দয়া কোরে আমাকে তোমাদের প্রধান সর্দ্দার কোরেচো, তখন আমার উপরোধে তোমাদের আরো কিছু কাল কষ্ট ভোগ কোত্তে হবে। আমি ডাকাত বটে, কিন্তু ধর্ম্মের ডাকাত। অধর্ম্মের ডাকাতিকে আমি নরকের চেয়েও ভয় করি। স্বরূপ! আমার প্রতিজ্ঞা, অধর্ম্মের জগতে ধর্ম্মের ডাকাতি কোরে স্বর্গের পথ নিষ্কণ্টক কোর্‌বো। চল, স্বরূপ! দুজনে মিলে মস্‌জিদে গিয়ে সকলকে বলি, অধর্ম্মের লোভে পোড়ে প্রাণ থাক্‌তে ধর্ম্মের অপমান করা কারই উচিত নয়। বরং ধর্ম্মের জন্য যাবজ্জীবন কষ্ট পাই, সেও ভাল, তবু অধর্ম্মের রাজছত্রও চাই নি। একমনে ধর্ম্মমূর্ত্তি ভগবান্‌ হরিকে ভক্তিভরে ডাকি চল. তিনিই ক্ষুধার সময় আহার দেবেন, পিপাসার সময় জল দেবেন, দুঃখের সময় সুখ দেবেন। স্বরূপ হে! বেশী বোল্‌বো কি, আমরা সকলে শ্রীহরির হুকুমের ডাকাত। যে

ডাকাতিতে পাপের বদলে পুণ্য হবে, দুঃখের বদলে সুখ হবে, অন্ধকারের বদলে আলো হবে, যন্ত্রণার বদলে শান্তি হবে, সেই ডাকাতিই ডাকাতি। তা বই যে ডাকাতি, তা পাপিষ্ঠ লোকেরাই ভালবাসে। ভগবান্ নারায়ণের কৃপায়, ভীম ভাম যে সকল ডাকাতের প্রধান কর্ত্তা, তারা ধর্ম্মের ডাকাত। সুতরাং আমার পরামর্শ ভিন্ন তাদের কোন কাজই করা ভাল নয়।

ভীম ভাম নীরব হইল। নীরব স্বরূপ রব তুলিয়া, সহর্ষে বলিল, "ভাই ভীম। তোমার এই সকল চমৎকার কথাতেই তো আমরা মোহিত হোয়ে যাই। সত্যি বোল্‌চি, ভীম! সত্যি বোল্‌চি, যখন দাবানলের মত জঠরানলে জ্বলি, তখন তোমার এই সুধাভরা কথাগুলি যেন শীতল জলের মত কাণের ভিতর দিয়ে গিয়ে পড়ে। জ্বলন্ত জঠরানল তখনি নিবে যায়।"

ভীম ভামের মনে সন্তোষ আসিল; ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা দেখা দিল; বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। তখন বলিল, "দেখ, স্বরূপ! সঞ্চিত অর্থ ফুরিয়েচে; কিন্তু ক্ষুধা ফুরায় নি। সুতরাং এই

বার সকলের মিলে মিশে গোটাকতক বিশেষ কাজ কর্‌বার সময় এসেচে।"

স্বরূপ। কি সে সব কাজ?

ভীম। ধর্ম্মের কাজ, অধর্ম্মের বাজ। যেখানে ধার্ম্মিক গৃহস্থ বা ধার্ম্মিক ধনী লোক আছে, সেখানে আমরা কখনই ডাকাতি কোত্তে যাব না। ধার্ম্মিকের ধনসম্পত্তি হরণ বা লুণ্ঠন করা মহাপাপ। কিন্তু যে সকল অধার্ম্মিক ও পরপীড়ক লোক হরির জীবগণকে যার পর নাই কষ্ট দেয়, পাপরূপ সমুদ্রের ভয়ঙ্কর তরঙ্গের মত উচ্চে উঠিয়া দীনদুঃখী ধর্ম্মভীরু লোকদের ঘাড়ে চাপিয়া পড়ে, তাদের যথাসর্ব্বস্ব লুট করি গে চল। তাদের বিষয় সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে গরীব দুঃখীদের দান করি গে চল। তার মধ্যে কিছু কিছু অর্থ নিজেদেব জীবনধারণের জন্য রাখ্‌বো। আবার শোনো, যদি কোথাও তেমন পাপিষ্ঠ লোকদের দেখা না পাই, তবে সকলে মিলে ভিখারী সেজে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা কোরে দিন যাপন কোর্‌বো। তথাপি অধর্ম্মের ডাকাতি কোর্‌বো না। শেষ কথা, হরি দিন দিলে তোমাদের দুঃখের সঙ্গে আমারও দুঃখের অবসান হবে।

স্বরূপ ভীম ভামের এই সকল কথা বিস্ময়ের সহিত শুনিতেছিল। যখন ভীম ভামের জিহ্বা বিরাম লইল, তখন স্বরূপ অতিশয় আহ্লাদে বিভোর হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। হর্ষগদ্গদভাবে দক্ষিণ হস্তে ভীম ভামের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "ভীম! ভীম! তুমি কে?"

ভীম ভাম ঈষৎ হাসিল, কিন্তু কোন উত্তর করিল না।

স্বরূপ আবার আগ্রহের সহিত বলিল, "ভাই ভীম! আমি কত বার জিজ্ঞেসা কোরেচি, কিন্তু তুমি কে, তা বল নি। আজ আবার জিজ্ঞেসা কোচ্চি, তুমি কে?"

এ বার ভীম ভাম উত্তর করিল, কিন্তু উত্তরটা বড় বাঁকা। স্বরূপকে বাধা দিবার জন্য বলিল, "ও স্বরূপ! আহা, দেখ দেখ, ঐ আধফোটা ফুলটিকে দুরন্ত কীটে কেটে কুটে খণ্ড বিখণ্ড কোরেচে।"

স্বরূপ। তাতে তোমার কি?

ভাম। ঐ ফুলের ব্যথায় আর আমার ব্যথায় কিছুই তফাৎ নেই।

স্বরূপ। তুমি কি বোল্‌চো, বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।

ভীম। আমি কে, জান্‌তে চাচ্চো, তাই পরিচয় দিলেম।

স্বরূপ। তুমি সকল সময়েই এই জড়ানে কথা কও।

ভীম। যে নিদারুণ জ্বালা যন্ত্রণায় জড়িয়ে আছে, সে জড়ানো কথাই তো বলে।

স্বরূপ। দোহাই তোমার, খুলে বল, তুমি কে?

ভীম। আমাকে খুলে বোল্‌তে হবে না। ভগবান্ হরি যে দিন মুখ তুলে চাবেন, সে দিন আমি কে, আপনা আপনি খুলে যাবে।

স্বরূপ। এখন্ বোল্‌তে দোষ কি?

ভীম। চল, এখন মসজিদে যাই।

এই বলিয়া ভীম ভীম স্বরূপের হাত ধরিয়া বনকুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মহামায়া ও দ্রবময়ী।

এখানে দ্রবময়ী একাকিনী কুটীরে থাকিতে না পারিয়া, মহামায়ার বাড়ীতে গিয়া নানাবিধ বাক্যালাপে কালক্ষেপ করিতেছিল। পাঠক মহাশয় ও পাঠিকা মহাশয়াকে, ইহার পূর্ব্বে মহামায়ার বিষয় কতকটা বলিয়াছি। এই বার আর একটু বিশেষ করিয়া বলা যাউক। কপিলপুর গ্রামে মহামায়ার নিজ বাটী ছিল না। তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা স্নেহময়ীর শ্বশুরবাটী এই গ্রামে ছিল। স্নেহময়ীর শ্বশুর শাশুড়ীর পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে একমাত্র স্বামী ও দুইটি দেবর ব্যতীত আর কেহ অভিভাবক ছিল না। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে মহামায়া বড় মেয়ের বাড়ীতে আসিয়া, অন্ততঃ তিন চার মাস করিয়া থাকিত এবং অভিভাবিকার কার্য্য করিত। ইহার পূর্ব্বে আর দুই এক বার আসিয়া, দ্রবময়ীর সহিত মহামায়ার আলাপ আত্মীয়তা হয়। এ বার সেই পুরাতন আলাপ আত্মীয়তা

আরও ঘনীভূত হইয়াছিল। মহামায়ার নিজ বাটী কাজীর হাট নামক একটি গ্রামে। কপিলপুর হইতে প্রায় কুড়ি ক্রোশ পশ্চিমে কাজীর হাট। এই দুই গ্রামের একটি হইতে অন্যটিতে আসা যাওয়া করিতে হইলে, পথিমধ্যে দুইটা ছোট ও একটা মাঝারি গোছের নদী পার হইতে হইত।

অদ্য মহামায়া, দ্রবময়ী ও স্নেহময়ীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া সাংসারিক কথা, গল্প, কাহিনী হইতে লাগিল। মহামায়া যথাসময়ে স্নেহময়ীকে দিয়া দ্রবময়ীর জলযোগের আয়োজন করাইয়া দিল। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। হিন্দুর গৃহে সন্ধ্যার সময় ধূনা দেওয়া, দীপ জ্বালা, তুলসীতলায় দীপদান, শঙ্খবাদ্য প্রভৃতি যে সকল মাঙ্গলিক ক্রিয়া হইয়া থাকে, তৎসমস্ত সমাপন হইল।

ক্রমে সন্ধ্যার আবির্ভাব দেখিয়া দ্রবময়ী মহামায়াকে বলিল, "তাই তো, দিদি! দিন গেলো, রাত এলো। তবুও যে দেখা নেই। দিন থাক্‌তেই ফের্‌বার কথা, তার তো কিছুই দেখ্‌চি নি।"

মহামায়া ঈষৎ হাস্যমুখী হইয়া বলিল, "দিন থাক্‌তেই ফের্‌বার কথা, না হয়, রাত থাক্‌তেই

ফির্‌বে। যদি নাই ফেরে, তবে দু' বোনে একসঙ্গে রাত কাটাবো। আজ বোলে নয়, এমন তো আরোও কত দিন হোয়েচে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মহামায়া আবার বলিল, "বলি, হ্যাঁ লা দের্‌বো! তোর স্বোয়ামী মাঝে মাঝে কোথায় সারা রাতটা কাটায়?"

দ্রব। তা তো কিছুই জানি নি। জিজ্ঞেসা কোল্লে বলেন, 'চাক্‌রির চেষ্টায় উমেদারী কোত্তে হয়, অনেকের খোসামুদ কোত্তে হয়, কাজে কাজে অনেক রাত্রি হোয়ে পড়ে। আস্‌তে পারি নি, সেইখানেই রাত কাটাই।'

মহা। তা সত্যি, বোন্‌: চাক্‌রির চেয়ে ঝক্‌মারি আর কিছুই নেই। বরং ভিক্ষে করা ভাল, তবু যেন চাকরি কোত্তে না হয়। আমার ছেলেটি একটি চাক্‌রি পাবার জন্যে দেশ বিদেশে ঘূরে কত কষ্টই না পাচ্চে। তবু ছাই ভাল চাক্‌রি যোটে না। তাতে আবার বাঙালির কাছে বাঙালির চাক্‌রির আশা! এর চেয়ে হরিণবাড়ী পাথর ভাঙা ভাল।"

উভয়ের এইরূপ সুখ দুঃখের কথা হইতেছে, এমন সময়ে স্নেহময়ীর কনিষ্ঠ দেবর বাড়ীর মধ্যে আসিয়া দ্রবময়ীকে বলিল, "তোমায় ডাকচে।"

দ্রবময়ীর উত্তর দিবার অগ্রেই মহামায়া বগলা-চরণকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ডাক্‌চে? ভীম?"

স্নেহময়ীর কনিষ্ঠ দেবরের নাম বগলাচরণ। সে বলিল, "হ্যাঁ গো।"

"তবে চল্‌ দেরবো, তোকে রেখে আসি।"

মহামায়া ও দ্রবময়ী প্রস্থান করিল।

[গল্পকল্পতরু চতুর্থ কুসুম।]

অদ্ভুত ডাকাত।

দ্বিতীয় অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লুঠ।

একটির পর একটি, তার পর একটি করিয়া আটটি বৎসর কাটিয়া গেল। নবম বৎসরটির ভোগ আরম্ভ হইল। অদ্য নবম বৎসরের প্রথম দিন—১লা বৈশাখ। জমীদার, তালুকদার ইত্যাদির অদ্য পুণ্যাহ এবং ব্যবসাদারের নূতন খাতা। অদ্য দেনা পাওনা, আদায় বিদায় বা আদান প্রদানের দিন। সঙ্গে সঙ্গে মুখমিষ্টিরও আয়োজন আছে।

আজ বেলপাড়ার কাছারিতে নাএব ও আমলারা বসিয়া রাইয়েৎদের নিকট খাজনা আদায় করিতেছে। হিন্দু, মুসলমান প্রজারা, যার যেমন সঙ্গতি, তাহার অপেক্ষা বেশী করিয়া জমিদারের প্রাপ্য খাজনা দাখিল করিতেছে। কাছারির

খাজনা-খানায় টাকার ঘন ঘন ঝন্ ঝন্ শব্দ হই-তেছে। সেই শব্দ এক কাণে রসা, এক কাণে কষা লাগিতেছে। রসা লাগিতেছে জমিদারের কাণে, কষা লাগিতেছে প্রজার কাণে। এ আবার যে সে জমিদারের কাছারি নহে,—সাক্ষাৎ যমের দ্বিতীয় মূর্ত্তি ধনেশ্বর সিংহ রায়ের কাছারি। মেথর যেরূপ জোঁক প্রতিপালন করে, ধনেশ্বর সেইরূপ আমলা, নাএব প্রতিপালন করিত। এই সব জোঁকরূপী আমলা নাএব অনবরত প্রজাদের অর্থ-রূপ রক্ত শোষণ করিত। জমিদার ভয়ঙ্কর কড়া, সুতরাং গরীব প্রজারা জীয়ন্তে মড়া। অনেক কষ্টে—অনেক দুঃখে আজ বেলপাড়া পরগণার প্রজারা, এক দিকে অনর্থের (বিপদের) হাত এড়া-ইবার জন্য, এবং অপর দিকে অনর্থ (অর্থশূন্য) হইবার জন্য, সিন্দুক, গেঁজে ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া অর্থ আনিয়া, নাএবের সম্মুখে ঢালিয়া দিতেছে। আম-লারা দুই একটা করিয়া 'রসকরা” দিয়া প্রজা-গণকে যেন “বশকরা”র মন্ত্র শুনাইতেছে। কিন্তু মিষ্ট রসকরার রসে প্রজারা তুষ্ট কি রুষ্ট হইতেছে, তাহা উৎপীড়ক জমিদারের জমিদারিতে যাঁহারা

বাস করেন, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন। এই উপন্যাসখানির পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে তেমন উৎপীড়িত প্রজার, বোধ হয়, অভাব নাই।

এইরূপে সমস্ত দিন ও রাত্রির প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত খাজনা-খানায় ধনেশ্বরের খাজনা আদায় হইল। তার পর গণনা করিয়া, খাতার সহিত মিলাইয়া, সমস্ত টাকা তোড়াবন্দী হইল। প্রত্যেক তোড়ায় দুই হাজার হিসাবে টাকার জমাট। এই রূপ সতেরটি পূরা তোড়া। তা ছাড়া একটি ছোট তোড়াও হইল। তাহার কোলে বা খোলে তিন শত সাঁইত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই ঠাঁই পাইল। মোট চৌত্রিশ হাজার তিন শত সাঁই-ত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই অদ্যকার আদায়। আবার আশ্বিন মাসেও এইরূপ এক দফা আদায় হইত। প্রজারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িত। এই তো গেল ধনেশ্বরের একটি জমিদারী, এইরূপ আরও তিন চারিটি জমিদারী ছিল। তৎসমস্তের আয় ইহার অপেক্ষা বেশী বই কম ছিল না। জমিদারীর আয় বাদে ধনেশ্বরের অন্যান্য প্রকারে অনেক টাকা আয় হইত। যে সমস্ত ঘৃণিত ও

ভয়ঙ্কর উপায়ে ধনেশ্বর সিংহ রায় স্বীয় ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহা মনে করিলেও পাপ হয়। দূর হউক, সে সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই।

ক্রমে হিসাব পত্র ঠিক্ করিয়া, নাএব ও আমলারা প্রায় রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় আহারাদি সম্পাদন করিল। তার পর কাহারো নিদ্রায়, কাহারো জাগায় রাত্রি প্রভাত হইল। বৈশাখের ১লা ভাসিল, ২রা আসিল।

জমিদার ধনেশ্বরের হুকুম ছিল যে, দুই তিন শতের বেশী টাকা কোন কাছারিতে মজুত থাকিবে না। সুতরাং প্রাতঃকালে নাএব মহাশয় যথোপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিয়া সামৃটী গ্রামে সমস্ত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। "চিনির বলদেরা" টাকার তোড়া মাথায় করিয়া প্রস্থান করিল। সঙ্গে পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী ভোজপুরী দ্বারবান্ ও পাঁচ জন আমলা চলিল। এ সময়ে ডাকাতি ও রাহাজানির ভয়টা বড় বেশী ছিল, তাই এত অস্ত্রধারীর প্রয়োজন হইয়াছিল।

বেলপাড়া হইতে সামৃটী গ্রাম দুই দিন ও

এক রাত্রির পথ। অর্থবাহক, অস্ত্রধাবক ও গুড়্‌ক-টানক লোকেরা বরাবর যাত্রা করিয়া ছয় ক্রোশ গমন করিল। উপনীত স্থলে একটি চটী ছিল। সেখানে সকলে স্নানাহার করিয়া, কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, আবার চলিতে লাগিল। আরও চার পাঁচ ক্রোশ গিয়া সন্ধ্যার সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। রাত্রিকালে রাশি রাশি টাকা লইয়া পথ চলা অনুচিত, সুতরাং তাহারা আর একটা চটীতে উপস্থিত হইল। যে গ্রামে সেই চটী, সে গ্রামের নাম মধুসূদনপুর। অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু অতি বৃহৎ নাম। সেখানে দুই চারিখানি সামান্য দোকান ছিল। সকলে যামিনী যাপনের নিমিত্ত একটা দোকানে আশ্রয় লইল। কিন্তু স্থান কুলাইল না। তজ্জন্য ঠিক পার্শ্বের দোকানেও স্থান লইতে হইল।

নানা দিকে নানা লোক যায়, যেখানে চটী পায়, সেখানে রাত কাটায়। অপর দোকানগুলিতেও অন্যান্য স্থানের লোকেরা বাসা লইয়াছিল। ধনেশ্বরের লোকেরা যখন সেই চটীতে আসিয়াছিল, তখন আর চার জন লোকও সেখানে

আসিয়া অপর একটা দোকানে বাসা লইয়াছিল। অপরিচিত লোক; কে কার খবর রাখে?

যখন রাত্রি প্রায় অর্দ্ধপ্রহর, তখন, সেই চারি জন লোকের মধ্যে দুই জন, অপর দুই জনকে চুপি চুপি কি বলিয়া, দোকান ছাড়িয়া গেল। কোথায় গেল, কি জন্য গেল, তাহা বলিতে পারি না। মধ্যে দোকানদার একবার উপস্থিত দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে অপর দুই জন আহারাদি না করিয়া কোথায় গেল। তাহারা উত্তর করিয়াছিল, "সে দুই জন আজি বাড়ী যাইবে, কারণ তাহাদের বাড়ীতে কার মর-মর ব্যারাম হইয়াছে। আমরা কাল সকালে যাইব।" এই পর্য্যন্ত।

রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, সেই সময়ে মধুসূদনপুরের আধ পোয়া দূরে একটা জঙ্গল মধ্যে অনেকগুলা বড় বড় মশাল জ্বলিয়া উঠিল। বড় অন্ধকার রাত্রি, সুতরাং প্রজ্বলিত মশালগুলার আভা প্রভা, জ্যোতি ভাতি, যা কিছু চাও, সমস্তই বেশ ফুটিয়া উঠিল। সেই আলোক-চ্ছটায় তরবারি, সড়কি প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্ররাজি

ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। দুই শতের অধিক লোক সেই সকল অস্ত্র ধরিয়া কোথায় যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি আয়োজন করিতে লাগিল। আয়োজন ঠিক হইল, সকলে জঙ্গল ছাড়িল! এত রাত্রে এত লোক, হাতে বিশাল মশাল, তরবারি ঢাল, সড়কি ফাল! কথা ভাল নয়তো! কারা এরা? বলিতে ভয় হয়।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর ঘটনা উপস্থিত! সেই সকল অস্ত্রধারী লোকেরা প্রবল জলপ্লাবনের ন্যায় অতি সত্বর মধুসূদনপুরের দুইটা দোকান ঘেরিয়া ফেলিল। গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়, এইরূপ অতীব বিকট চীৎকারে নৈশগগন কাঁপাইয়া তুলিল। যে দোকানে সেই দুই জন লোক ছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ কি একটা সঙ্কেত শব্দ করিয়া, অস্ত্রধারী ও চীৎকারকারীদের দলে মিশিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে আগন্তুক অস্ত্রধারীরা, প্রখর অস্ত্রসমূহ উত্তোলন করিয়া, ধনেশ্বরের লোকগণকে অতি ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জনে বলিতে লাগিল, "এইও শূয়ার লোক! লাও সব রূপিয়াকা তোড়া —জল্‌দি লাও—আভি লাও—তোড়া দেখ্‌লাও

—নেহি তো আভি সব কোইকো গর্দান্ লেঙ্গে।"

মহাবিভ্রাট উপস্থিত! কি হইবে, কি করিবে, কি বলিবে, কেহই কিছু ঠিক্ করিতে পারিল না। চার জন আমলা ও মুটিয়ারা তো ভয়ে জড়সড় হইয়া, আঁকু পাঁকু করিতে লাগিল। কিন্তু নিমক্-হালাল ভোজপুরীরা একচোট রুখিয়া উঠিল। ঢাল তরবাল্ ধরিয়া, "আও ডাকু, আও ডাকু" বলিয়া কিয়ৎক্ষণ যুঝিল। কিন্তু পারিল না, হারিয়া গেল। ডাকুর সংখ্যা বেশী এবং অডাকুর সংখ্যা কম, সুতরাং হারিবারই কথা।

অনন্তর দস্যুরা সমস্ত তোড়াবন্দী টাকা মস্তকে উঠাইয়া নির্ভীকচিত্তে প্রস্থান করিল। অস্ত্রধারী দস্যুরা, তাহাদিগকে ঘেরিয়া, সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। ধনেশ্বরের ধনশূন্য লোকেরা অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত দোকান শূন্য দেখিতে লাগিল। একে ডাকাতের হাতে জখম, তাহাতে ধনপিশাচ ধনেশ্বর না জানি আরও কি শাস্তি দিবে, এই ভাবিয়া বেচারীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল!

"টাকা" উল্টাইলে কি হয়? "কাটা" হয়;

যথা—"টাকা"—"কাটা"। এই উল্টা পাল্টায় কি বুঝায়? বুঝায় এই, যেখানে টাকা, সেইখানেই কাটা। মনিবের টাকার দায়ে গরীব চাকর বেচারীদের মধ্যে কতকগুলির হাত পা আঙ্গুল কাটা পড়িল। বাস্তবিক, যে শব্দবিৎ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে অর্থের নাম "টাকা" রাখিয়াছিল, সে বড় ভুক্ত-ভোগী।

যৎকিঞ্চিৎ ভাড়া পাইবার আশায়, গরীব দোকানদার আজ কি কুক্ষণেই টাকার তোড়া-ওয়ালাদের স্থান দিয়াছিল। বেচারার ভাড়া তো গেলই, শেষে দোকানে যা কিছু জিনিষপত্র ছিল, তাহাও লণ্ডভণ্ড হইয়া নষ্ট হইয়া গেল। এক ভাড়ার আশায় গরীব ভেড়া হইয়া গেল! কিন্তু এখনও যে, সে দস্যুহস্তে নিষ্কৃতি পাইয়া খাড়া আছে, এই তার পরম সৌভাগ্য!

ডাকাতেরা জয়লাভের সহিত অর্থলাভ করিয়া, ফিরিয়া যাইবার সময় কতকগুলা বন্য লতা ফেলিয়া দিয়া, বলিয়া গিয়াছিল, "জখমীরা এই লতার রস কাটা জায়গায় দিস্। রক্ত-পড়া বন্ধ হবে—ব্যথা টাটানি সেরে যাবে।" আহতেরা তাই করিল। উপকার

পাইল। কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের কথা যে, ডাকাতেরা ডাকাতি করিতে আসিয়া, কোথায় খুন জখম করিয়া আনন্দ লাভ করিবে, তা না হইয়া, আবার ঔষধ দিয়া গেল। এরা কি রকম ডাকাত? কে এই ডাকাতদলের দলপতি? আমার বোধ হয়, সেই——থাক্, আর বলিবার আবশ্যক নাই—পাঠক পাঠিকারা বুঝিতে পারিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংবাদ—প্রমাদ—বিষাদ।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ধনেশ্বর সিংহ রায়ের লোকেরা সামৃটী গ্রামে উপনীত হইল। সকলেই ভয়বিমর্ষ ও দুঃখলজ্জিতচিত্তে ধনেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিল। ধনেশ্বর অবাক্ হইয়া শুনিল। মুখ শুকাইল, ধড় ছাড়িয়া প্রাণ যেন কোথায় উড়িয়া গেল। একটি অতি দীর্ঘনিশ্বাস তাহার নাসারন্ধ্র ভেদ করিয়া, তাহার অন্তর্বিপ্লবের অবস্থা টানিয়া লইয়া বাহির হইল। ধনেশ্বরের নিদারুণ কষ্ট হইল। কিন্তু, ধনেশ্বর! তোমার এ কষ্টে অপরের কষ্ট হইবে না। তুমি শত শত দীন দরিদ্র প্রজাকে বিজাতীয় কষ্ট দিয়া, যে অর্থশোষণ করিয়াছিলে, আশা করি, তাদের কষ্টসমষ্টির একমুষ্টি তুমি এখন বুঝিতে পারিয়াছ। পরকে কষ্টে দিলে নিজেকে কষ্ট পাইতে হয়, পরকে কাঁদাইলে নিজেকে কাঁদিতে হয়, এবং পরের মন্দ করিতে গেলে নিজের

মন্দ আগে হয়, এই মহানীতি-বাক্য যদি তুমি মান্য করিতে, মান্য করিয়া ন্যায়পথে চলিতে, তবে কি আজ তোমাকে আব্রহ্মস্তম্বভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে হইত? ধনেশ্বর! এখনও হিতাহিতের দর্পণস্বরূপ বিবেকের নির্ম্মল ফলকে আপনার মনের মুখ দেখ, ভবিষ্যতে আর কষ্ট ভুগিতে হইবে না। কিন্তু সে আশা বৃথা! ধনেশ্বর ধনান্ধ—লোভান্ধ! ধনেশ্বর নরপিশাচ!

অনেকক্ষণ নীরবে নীরবে চলিয়া গেল। ধনেশ্বরের মুখে একটিও শব্দ নাই, কিন্তু মনের ভিতর শোক, তাপ, কষ্ট, নৈরাশ্য, দুশ্চিন্তা, যন্ত্রণা যুগপৎ শব্দ করিতে লাগিল। তাহারই দুই একটা ছিন্ন ভিন্ন শব্দ নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। পরে অন্তঃসমুদ্রের অনন্ত শব্দতরঙ্গ হইতে একটা শব্দ উথলিয়া ধনেশ্বরের মুখবিবর দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। সে শব্দটা এই,—"হায় হায়, একবারে চৌত্রিশ হাজার তিন শ সাঁত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই ডাকাতে লুটে নিলে!"

ক্রমে অন্দরমহলে এই সর্ব্বনাশের কথা প্রবেশ করিল। ধনেশ্বরপত্নী শ্রীমতী ভাঙ্গিনী

ছায়াস্বরূপিণী অর্দ্ধাঙ্গী, সুতরাং কায়াস্বরূপ অর্দ্ধাঙ্গ পতির অবস্থা পাইতে তাহার আর কালবিলম্ব ঘটিল না। দেখিতে দেখিতে বাহিরে অন্দরে শোকোচ্ছ্বাস ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের স্রোত ছুটিল—তোড় উঠিল!

বাড়ীর দাস দাসী ও অন্যান্য পরিজনেরাও কর্ত্তা গিন্নীর দশা পাইল। কিন্তু এদের মধ্যে, বোধ হয়, সাড়ে পনর আনা লোকের হা-হুতাশটা কেবল মৌখিক। কারণ, ধনেশ্বরের জ্বালায় অনেক্‌কেই পরমেশ্বর স্মরণ করিতে হইত।

ধনেশ্বরের দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠার নাম সরলা; বয়স প্রায় নয় বৎসর। কনিষ্ঠার নাম তরলা; বয়স প্রায় সাত বৎসর। রূপে দুইটিই যেন দুইটি জীবন্ত চাঁদ।

যখন অন্দরমহলে, ডাকাতে টাকা লুঠ করিয়াছে, এই কথা রাষ্ট্র হইল, তখন সরলা, তরলা খেলা করিতেছিল। কথা উঠিল এক, তাহারা শুনিল আর। উভয়ে ভাবিল, বাহির-বাড়ীতে বুঝি ডাকাত ধরিয়া আনিয়াছে। তাই দেখিবার নিমিত্ত দুই জনে দৌড়িয়া বৈঠকখানায় পিতার

নিকট আসিল। উভয়েই অতি ব্যগ্রতা ও কৌতুহলের সহিত "বাবা, ডাকাত! বাবা, ডাকাত!" বলিয়া, মধুর কণ্ঠের মধুর ধ্বনিতে বৈঠকখানা ধ্বনিত করিল।

ধনেশ্বর সাড়া শব্দ দিল না। "নির্ব্বাতনিষ্কম্প-প্রদীপমিব" বসিয়া রহিল।

যে চার জন আমলা, বেলপাড়ার কাছারী হইতে ধনেশ্বরকে টাকা বুঝাইয়া দিতে আসিয়াছিল, তাহারা বৈঠকখানায় এখনও বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তিনটি প্রৌঢ় এবং একটি যুবা ছিল। সেই যুবাটির নাম যাদবেন্দ্র রায়। বয়সের সীমা ত্রিশের মধ্যেই। দেহবর্ণ উজ্জ্বল গৌর, মুখশ্রী অতি সুন্দর। সরলা ও তরলার রূপমাধুরী যাদবেন্দ্রের অক্ষিযুগলে প্রতিফলিত হইল। ক্ষণপরেই সরলার নবস্ফুটন্ত বদনকমলের দিকে যুবকের অক্ষিভ্রমরযুগল অচল হইয়া রহিল।

পূর্ব্বে যাদবেন্দ্র আরো দুই চারি বার ধনেশ্বরের বাটীতে আসিয়াছিল। কিছু দিন হইল, ধনেশ্বরের বেলপাড়ার কাছারীতে যাদবেন্দ্র রায় নকলনবিশের একটি কার্য্য পাইয়াছিল। খোরাক

পোশাক ছাড়া মাসিক বেতন আট টাকা। মাঝে মাঝে কিছু উপরি পাওনাও ছিল, কিন্তু অসৎ উপায়ে নহে।

ধনেশ্বর যাদবেন্দ্রকে কতকটা ভালবাসিত। সে ভালবাসা তাহার নকলনবিশী কার্য্যের জন্য নহে, অন্য একটি মহৎ কার্য্যের জন্য। এখানে সেই কার্য্যটির উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া আমি ভরসা করিতে পারি। যখন সর্ব্বপ্রথম যাদবেন্দ্র, চাকুরির প্রার্থনায় ধনেশ্বরের নিকট আসে, তখন তাহার অত্যন্ত আর্থিক কষ্ট ঘটিয়াছিল। সে, সে জন্য ধনেশ্বরের বাটীতে চাট্টি খাইতে পাইলেই, ধনেশ্বরের ফায় ফরমাইস খাটিতে প্রস্তুত ছিল। ধনেশ্বরও একে পায়, আরে চায়। যদি কেবল দুবেলা দুমুঠা খাইয়াই একটা লোক তাহার দপ্তরের কাজ কর্ম্ম করে, তার চেয়ে সুখের বিষয় কি? কাজেই ধনেশ্বর সম্মত হইয়াছিল এবং নিজ গ্রামের নিজ কাছারীবাড়ীতেই যাদবেন্দ্রকে রাখিয়াছিল।

যাদবেন্দ্র আপাততঃ পেটভাতায় চাকরি করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে প্রায় এক বৎসর

গত হইল। তবু সেই পেটভাতা। যাই হৌক্, পেটভাতায় তাহার ভবিষ্যতের পথটা অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছিল। কার্য্যকরী বুদ্ধি ও হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হইয়াছিল।

সেই সময়ে এক দিন যাদবেন্দ্র মধ্যাহ্নসময়ে ধনেশ্বরের বাটীপার্শ্বস্থ একটা বড় পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। যখন জলে নামিয়া স্নান করিতেছিল, তখন পুষ্করিণীর অপর পারে সরলা ও তরলা খেলা করিতেছিল, ছোট ছোট গাছ থেকে ফোটা ফোটা ফুল তুলিতেছিল। পুষ্করিণীর পাড়ে অনেকগুলি ফুলের গাছ ছিল। গাছের ঝাড়ে স্থানটা ঝোপের মত হইয়াছিল। দুই ভগিনী অন্যমনস্ক হইয়া, এদিক ওদিক ঘুরিয়া, আঁচল ভরিয়া ফুল রাখিতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বৃহদাকার ভেক, ঝোপের ভিতর হইতে সরলার পায়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। অন্যমনস্কা সরলা তৎক্ষণাৎ ভয়ে দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দুর্দৈবক্রমে ভয়বিহ্বলা বালিকা, পদস্খলিত হইয়া; পুষ্করিণীর জলে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। পুষ্করিণীর ঢালুভাগটা জলের

ভিতর পর্য্যন্ত গড়ানে ভাবে থাকাতে, অভাগিনী সরলা জলের ভিতর তলাইয়া গেল। সরলাকে আর দেখা গেল না, কিন্তু তাহার অঞ্চলসঞ্চিত পুষ্পরাশি জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। আহা, জীবন্ত ফুলটি ডুবিল, কিন্তু ভাসিল না, আর অ-জীবন্ত ফুলগুলি ডুবিল, কিন্তু ভাসিল। কেন এমন হইল? জীবন তো সামান্য বায়ুমাত্র; বায়ু যে অতি লঘু, জলে ডোবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, যে জীবন বা প্রাণকে আমরা অতি লঘু ভাবি, তা অতি ভারী, এবং যে অজীবন্ত পদার্থকে ভারী ভাবি, তা অতি লঘু। তার প্রমাণ, পুষ্করিণীর জলে সরলা ও ফুল।

এ দিকে কনিষ্ঠা ভগিনী তরলা, কিঞ্চিৎ দূরে অন্য দিকে ফুল তুলিতেছিল। জলে কি পড়িল, শব্দে এই অনুমান করিয়া, সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। তরলা দেখিল, তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সরলা ফুলবনে নাই। আরো দেখিল, পুষ্করিণীর জলে মেলাই ফুল ভাসিতেছে এবং অসংখ্য বুদ্বুদ উঠিতেছে। অমনি সে বুঝিতে পারিল, সরলা জলে ডুবিয়া গিয়াছে। কনিষ্ঠা ভগিনীর কনিষ্ঠ

প্রাণ, ব্যথা কিন্তু বলিষ্ঠ হইল। তৎক্ষণাৎ সে উচ্চৈঃস্বরে, "দিদি ডুবে গেলো—দিদি ডুবে গেলো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ও দিকে যাদবেন্দ্রও সরলাকে জলে গড়াইয়া পড়িতে ও ডুবিতে দেখিয়াছিল। সে, তরলার রোদন-চীৎকারের পূর্ব্বেই অতি দ্রুত জল হইতে উঠিয়া, আর্দ্র বসনে পুষ্করিণীর পাড় দিয়া দৌড়িয়া আসিল এবং পলকমধ্যে জলে ঝাঁপিয়া পড়িয়া ডুব দিল।

এ দিকে তরলা, কাঁদিতে কাঁদিতে, পিতামাতাকে এই ভয়ঙ্কর সংবাদ দিতে বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ধনেশ্বর, ভামিনী ও অন্যান্য লোকেরা "হায় হায়, কি হ'ল, কি হ'ল" বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, জলে কেবল ইতস্ততঃ ফুল ভাসিতেছে, ঘন ঘন বুদ্বুদ উঠিতেছে—জল কাদায় ঘোলা হইতেছে। ধনেশ্বরের এই শোচনীয় দৃশ্য যেমন দেখা, অমনি বলা—"এস সবাই, জলে ডুবে খুঁজি।"

এই কথা বলিতে বলিতে ধনেশ্বর ও অন্যান্য

পুরুষেরা জলে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিল এবং ভামিনী প্রভৃতি রমণীরা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে অকস্মাৎ "হারানিধি বিধি মিলাইল।"

সরোবিরসলিলে পদ্ম ফুটিয়া উঠিল। যাদবেন্দ্র অচেতনা সরলাকে, পূর্ব্বে দুই তিন ডুবে পায় নাই, এইবার তুলিয়া ভাসিয়া উঠিল। তটে চাহিয়া দেখিল, লোকে লোকারণ্য—সকলেই বিষণ্ণ ও ব্যাকুল।

এই আশাতীত দৃশ্য দেখিয়া ধনেশ্বর ও ভামিনী কি পর্য্যন্ত যে আহ্লাদিত হইল, তা আর বলিতে হইবে না। ধনেশ্বর হর্ষভরে বলিয়া উঠিল, "কে? যাদব? বাবা, আজ আমাদের মৃত দেহে প্রাণ দিলি।"

ধনেশ্বরের এই কথা শেষ হইতে না হইতে যাদবেন্দ্র জল ছাড়িয়া স্থলে উঠিল।

ভামিনী হাত তুলিয়া যাদবেন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিল।

অনন্তর যথাবিহিত প্রক্রিয়ায়, সরলার উদরস্থ জল বাহির করা হইল। সরলা চেতনা লাভ করিল;

কিন্তু দুর্ব্বল থাকাতে কথা কহিতে পারিল না। ভামিনী তাড়াতাড়ি স্নেহের কন্যা সরলাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া বাটীর দিকে আস্তে আস্তে যাইতে লাগিল। অন্যান্য সকলে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। যাইতে যাইতে ধনেশ্বর যাদবেন্দ্রকে বলিল, "যাদব! তুমি এখানে কিরূপে এসেছিলে?"

যাদবেন্দ্র আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিল। তখন ধনেশ্বর যার্-পর-নাই পুলকিতচিত্তে বলিল, "বাবা যাদব! ভাগ্যে তুমি স্নান কোত্তে কোত্তে সরলাকে দেক্তে পেয়েছিলে, নৈলে আজ জন্মের মতন হারিয়েছিলেম। তুমি আজ আমার যে অপরিসীম উপকার কোল্লে, তার প্রত্যুপকার কর্বার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমার ক্ষমতায় যার চেয়ে আর বেশী কিছু হতে পারে না, তাই কোর্বো। তুমি আমার স্বজাতি, অতএব তোমার সহিত আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহ দেবো। দুই তিন মাসের মধ্যেই এই শুভকার্য্য সমাধা কোর্বো। আমি সকলের সমক্ষে তোমার নিকট এই প্রতিজ্ঞা কর্লেম্।"

ধনেশ্বরের এই উপযুক্ত প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া

অন্যান্য সকলে তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল। ভামিনী অতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর সকলে বাটীমধ্যে প্রবেশ করিল।

পাঠক মহাশয়! পাঠিকা মহাশয়া! এই সেই যাদবেন্দ্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একের প্রতিজ্ঞাভঙ্গে অপরের আশাভঙ্গ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, যাদবেন্দ্রের সহিত সরলার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে কি না? উত্তর,—হয় নাই। দ্বিতীয় প্রশ্ন,—সে কি! গত বৎসরে সরলা জলে ডুবিয়াছিল, সেই সময়ে ধনেশ্বর দুই তিন মাসের মধ্যেই যাদবেন্দ্র ও সরলার দুই হাত এক করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, তথাপি দুই হাত দুই ঠাঁই কেন? দ্বিতীয় উত্তর,—ধনেশ্বর ধনলোভে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে—ধর্ম্মের মাথায় পা দিয়াছে। যতটুকু সময়ের জন্য ধনেশ্বরের মনে টাকার নাম জাগে না, ততটুকু সময়ের মধ্যে ধনেশ্বর ধার্ম্মিক, সাধু, সচ্চরিত্র, বড় উদার। কিন্তু যাই টাকা জাগিল, অমনি ধনেশ্বর কুবিশেষণসমুদ্রে গা ভাসান দিল। সুতরাং যাদবেন্দ্রের সঙ্গে সরলার বিবাহব্যাঘাত ঘটিয়া গিয়াছিল।

ধনেশ্বর এত দূর পিশাচ যে, পাছে যাদবেন্দ্র

কাছে থাকিলে, তাহার সহিত সরলার বিবাহের কোনরূপ সুযোগ ঘটে, এই নিমিত্ত, সরলা-উদ্ধারের এক মাস পরেই, নিজ কাছারী হইতে তাহাকে বিদায় দিয়া, বেলপাড়ার কাছারীতে পাঠাইয়া দিয়াছিল। যাদবেন্দ্র সেখানে গিয়া, বিবাহের পরিবর্ত্তে, খোরাক পোষাক ছাড়া আট টাকার নকলনবিশী চাকুরি পাইয়াছিল। ইহাতে যে, সে সুখী হইয়াছিল, তা' তো বোধ হয় না। কিন্তু দরিদ্রের আশা মনে জাগিয়া, আবার মনেই ঘুমাইয়া পড়ে। যাদবেন্দ্রেরও তাই।

ইতিমধ্যে বেলপাড়ার কাছারীতে থাকিয়া যাদবেন্দ্র শুনিয়াছিল যে, বৈশাখ মাসের আঠাশে তারিখে অপর পাত্রের সহিত ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহ হইবে। সেই পাত্র এক জন ধনবান্ জমীদারের পুত্র। নির্ধন যাদবেন্দ্র, তাহার পক্ষে এই নিদারুণ সংবাদে যে, বজ্রাঘাতের অপেক্ষা মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পাইয়াছিল, তাহা আর বলিতে হইবে না। সংবাদ পাইবার দিন হইতেই তাহার আর ধনেশ্বরের অধীনে চাকুরি করিতে ইচ্ছা রহিল না। যাদবেন্দ্র দেখিল, ধনেশ্বর দ্বিভাষী, মিথ্যা-

প্রতিজ্ঞ, কপট, পিশাচ। সুতরাং এমন লোকের অন্নগ্রহণ করায় পাতক আছে। যাদবেন্দ্রের মনে বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিল। সেই ঘৃণাই তাহাকে পিশাচের চাক্‌রি ছাড়িতে উত্তেজিত করিল। তাই আজ ভগ্নহৃদয় যাদবেন্দ্র কর্ম্মে ইস্তফা দিতে আসিয়াছে। অন্য সময় আসিবার সুযোগ পায় নাই। আজ খাজনা জমা দিতে আসিবার সুযোগে মনের কথা বলিতে আসিয়াছে। কিন্তু পথে টাকা লুঠ হওয়াতে এবং তজ্জনিত সংবাদে ধনেশ্বরের ঔদ্বিগ্ন ঘটাতে, বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছে না। বৈঠকখানায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

যাদবেন্দ্র সরলাকে বড় ভালবাসিত। সামটী গ্রাম ছাড়িয়া, বেলপাড়ায় যাইবার তার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। তথাপি মধ্যে মধ্যে বেলপাড়ার কাছারীর কার্য্যাদির সংবাদ লইয়া, এখানে আসিত। পাঁচ ছয় দিন থাকিত। সেই সুযোগে ভবিষ্যা পত্নী সরলাকে দেখিয়া লইত। সেই দেখায়, যাদবেন্দ্র আপনাকে কি পর্য্যন্ত সুখী জ্ঞান করিত, তা এরূপ

দেখা যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিতে পারে। আহা, সে সাধের দেখা ঘুচিয়াছে! আজ যাদবেন্দ্র বিষাদের দেখা দেখিতে আসিয়াছে। বিধিবাদ সাধিয়াছে ; যাদবের আশার বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে! যাদবেন্দ্র আজ প্রাণে মরা। মরা প্রাণ আজ বিষে ভরা!

পূর্ব্বে বলিয়াছি, হতাশ যাদব সরলার মুখপানে চাহিয়াছিল। এখন বলিতেছি, আর সে সহিতে পারিল না। কেন পারিল না? তার কারণ আছে। তরলা যাদবেন্দ্রকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে সরলাকে বলিল, "বড় দিদি! তোর বর এয়েচে।" তাই যাদবেন্দ্র আর চাহিতে পারিল না। ভাঙা মরমে শরম বাজিল! তাহার ফল হইল আঘাতের উপর আঘাত—মর্ম্মভেদিনী যন্ত্রণা!

যাদবেন্দ্র বৈঠকখানার বাহিরে গেল। বাহিরে কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া, বাটীর বাহিবে গেল। তথা হইতে সামটী গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল।

টাকার শোকে ধনেশ্বরের কি হইল, না হইল, তা বলিতে আমার ইচ্ছা নাই। ধনেশ্বর শীঘ্র ধ্বংস হউক!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

টাকার ভাগ।

এইবার অন্য দিকে যাই। রাত্রি ভোর ভোর হইয়াছে, সুতরাং অন্ধকারের ঘোর ঘোর নাই। ঊষার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু এখনও ভাল করিয়া চক্ষু মেলিতে পারিতেছে না, তাই আধফোটা আলো আর আধফোটা কালোর কোলে গাছ পালা, লতা পাতা, জল স্থল ঘেঁসাঘেঁসি মেশামেশি করিতেছে।

ক্রমে পূর্ব্বদিকের দিগঙ্গনা ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি কিন্তু এখনও মলিন, যেন অমার্জ্জিতদন্তা রমণীর হাসি। তাহার সেই মলিন হাসি দেখিয়া, আনন্দেই হউক, বা পরিহাসেই হউক, নানাবিধ পক্ষী বৃক্ষশাখায় ডাকিয়া উঠিল। তাহাদের ডাকাডাকিতে নিদ্রিতা পৃথিবী জাগিল।

এমন সময়ে সেই অরণ্যের ভগ্ন মস্‌জিদের নিকট অনেকগুলি লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সংখ্যা আড়াই শতের কম হইবে না।

সকলেই প্রফুল্ল। দেখিলে বোধ হয়, যেন অনেক গুলি স্ফূর্ত্তির মূর্ত্তি একত্র হইয়াছে। এরূপ হইবার একটা বিশেষ কারণ আছে। তাহাদের সঙ্গে অনেক টাকার তোড়া রহিয়াছে।

অনন্তর সকলে মস্‌জিদের মধ্যে টাকার তোড়াগুলি রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। কেহ শুইয়া পড়িল। কেহ তামাক টানিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে আকাশ বেশ ফসা হইল। অরণ্যময় প্রভাত-সূর্য্যের নবীন কিরণ ছড়াইয়া পড়িল। অরণ্যের যেমন অন্ধকাররূপ দুঃখের অবসান হইয়া, আলোকরূপ সুখের উদয় হইল, সেইরূপ এই সকল লোকের অনর্থরূপ দুঃখ ঘুচিয়া, অর্থরূপ সুখ দেখা দিল।

প্রায় বেলা এক প্রহর হইয়াছে, এমন সময় একটি বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি সেই স্থানে দ্রুতগতিতে উপনীত হইল। তাহাকে দেখিয়া তত্রস্থ লোকেরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিল, "বড় সর্দ্দার! প্রায় সাড়ে সতের তোড়া। এক এক তোড়ায় দুই দুই হাজার টাকা!"

বড় সর্দ্দার কে? ভীমভাম। ভীমভাম এই

কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "এইবার তোমাদের খাওয়া পরার দুঃখ ঘুচ্‌বে তো ?"

তাহারা একবাক্য বলিল, "খুব খুব।"

পাঁচু বলিল, "বড় সর্দ্দার! তুমি খুব সন্ধানী। কি বুদ্ধি-কৌশল ঘটিয়েই আমাদের পাঠিয়েছিলে, যা হোক্।"

ভীমভাম বলিল, "কি করি, পাঁচু, বল। তোমাদের কষ্ট দেখে আর তিষ্ঠুতে পারিনি। সর্ব্বদাই ভাবিত ছিলেম। আর, তোমরা তো জানই যে, দুষ্ট লোকের ধন হরণ করাই আমার উদ্দেশ্য। আজ প্রায় আট বৎসর হোয়ে গেল, সে-কথা মনে আছে তো ? আমি বলেছিলেম, অধার্ম্মিকদের উপর আমার ডাকাতি। এই আট বৎসর মধ্যে, চার পাঁচটা সেই রকম বই পাইনি। তোমাদেরো আশ মিটিয়ে তুষ্ট কোত্তে পারিনি। অনেক দিনের পর এইবার আর একটা অধার্ম্মিকের টাকা লুট হোলো। ভগবান্‌কে সকলে মিলে দণ্ডবৎ কর।"

এই কথা শুনিবামাত্র ডাকাতেরা "জয় ভগবান্!" বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের

পানে চাহিয়া প্রণাম করিল। তার পর ভীমভাম তাহাদের মুখে লুণ্ঠন ঘটনার সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিল।

স্বরূপ শৌচক্রিয়া সারিতে গিয়াছিল। এতক্ষণে ফিরিয়া আসিল। ভীমভাম তাহাকে দেখিয়া বলিল, "কেমন, স্বরূপ! মঙ্গল তো?"

স্বরূপ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "ভীম যাদের সহায় সম্পত্তি, আশা ভরসা, বল বুদ্ধিদাতা, তাদের মঙ্গল অতি উঁচুদরের ভাই!" এই বলিয়া আবার বলিল, "চল একবার তোমার কৌশলের সুফল দেখাই।" এই বলিয়া ভীমভামের হস্ত ধারণ করিয়া, যেখানে তোড়াগুলি রক্ষিত ছিল, সেখানে উপস্থিত হইল। ভীমভাম দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিল।

অনন্তর ভীমভাম স্বরূপকে বলিল, "এখন গোটা কতক কাজ কোত্তে হবে।"

স্বরূপ। কি?

ভীম। কালী মার পূজা আর হরিলুটের জন্য যার যেমন মানসিক, সেই মত রেখে, এই লুঠের ঠিক অর্দ্ধেক টাকা মাটীর ভিতর গেড়ে রাখতে হবে।

স্বরূপ। কেন?

ভীম। সময়ে দরকারে লাগিবে।

স্বরূপ। বেশ কথা। আচ্ছা, তার পর?

ভীম। যে দোকানদারের দোকানে এই ঘটনা ঘটে, তার কত টাকার জিনিষপত্র লোক্‌সান হয়েচে?

স্বরূপ। আন্দাজ ত্রিশ চল্লিশ টাকার।

ভীম। তাকে এক শ টাকা দিয়ে আস্‌তে হবে।

স্বরূপ। তা বেশ কথা। কিন্তু—কে—যা—

ভীম। (বাধা দিয়া) তার চিন্তা কি? আমিই মধুসূদনপুরে গিয়ে দোকানদারকে টাকা দেবো।

স্বরূপ। এখন এ ডাকাতির কথা চাদ্দিকে চাউর হয়েচে। যদি ধরা টরা পড়, তবে—

ভীম। (বাধা দিয়া সহাস্যে) কোন ভয় নেই। এখন আমার শেষ কথা এই, বাকি টাকা যোগ্যানুসারে সকলকে ভাগ কোরে দাও। তুমিও নেও। আমাকেও কিছু দাও।

ভীমভামের আদেশানুসারে সেই কার্য্য সমাধা হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গভীর নিশায়।

যাদবেন্দ্র সেই রাত্রেই ধনেশ্বরের বাটী ত্যাগ করিয়া বরাবর কোথায় চলিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রে মাঠ ভাঙ্গিয়া, কণ্টকিত ঝোপ ঝোড়ের ভিতর দিয়া পথ চলা বড় সহজ কথা নহে। কিন্তু যাহার প্রাণ মন হৃদয়, নৈরাশ্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে মগ্ন, যন্ত্রণার কণ্টকাঘাতে ভগ্ন, তার আবার জড়প্রকৃতির অন্ধকার ও কণ্টকে ভয় কি? যাদবেন্দ্র বরাবর চলিল, এ দিক ও দিক করিয়া, পথকে অপথ, অপথকে পথ করিয়া চলিল। দেখিলে বোধ হয়, যেন হাইল-ভাঙ্গা একখানি নৌকা দুর্দ্দমনীয় স্রোতের মুখে পড়িয়া ঘূরপাক খাইয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, কোথায় যাইতেছে। যেরূপ অবস্থা, নৌকা ডোবে কি ভাসে, তার ভরসা নাই।

আজ যাদবেন্দ্রের যে মর্ম্মভেদিনী যন্ত্রণাময়ী দশা, ইহার জন্য যাদবেন্দ্র দোষী, না ধনেশ্বর

দোষী? ন্যায়সঙ্গত বিচার করিলে, ইহাতে যাদবেন্দ্রের অণুর অণুমাত্রও দোষ নাই, যত দোষ সেই নবপিশাচ ধনেশ্বরের। দরিদ্র যুবা যাদবেন্দ্র যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ধনবান্ ধনেশ্বরের কন্যাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিত, তবে যাদবেন্দ্রই সমস্ত অপরাধে অপরাধী হইত। সে যেমন, পঙ্গুর পর্ব্বতলঙ্ঘনের ন্যায়, পক্ষহীনের আকাশে উড্ডয়নের ন্যায়, দরিদ্র হইয়া ধনীর কন্যালাভে দুরাকাঙ্ক্ষা করিত, তেমনি উপযুক্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিত; তাহাতে কাহারই তাহার প্রতি সহানুভূতি জন্মিত না। কিন্তু সে বেচারা তো তা করে নাই। সে স্বপ্নেও ধনেশ্বরের কন্যালাভের ভাবনা ভাবে নাই। তাহার সর্ব্বনাশ তো মহাপাপিষ্ঠ, ঘোর মিথ্যাবাদী, দেবতার অপেক্ষাও পূজনীয়া প্রতিজ্ঞার অবমাননাকারী ধনেশ্বর করিয়াছে, তাহাকে আর্জ পাগল করিয়াছে, প্রাণে মারিয়াছে, নৈরাশ্যের অকূলপাথারে ভাসাইয়াছে। ধিক্ ধনেশ্বর! তুমি সামান্য ধনের লোভে, অমূল্য ধন ধর্ম্মের অপমান করিলে! শুধু তুমি নও। তোমার মত শত শত মনুষ্যরূপী নরকের কীট তোমার পাপ পথের

পথিক। তোমার ন্যায় তারাও, নানা বিষয়ে নানা লোককে আশ্বাস দিয়া, বিশ্বাস ভাঙ্গে—কথা দিয়া ব্যথা দেয়—আশা দিয়া দুস্তর নৈরাশ্যসাগরে ভাসায়—বিদ্যুজ্ঝলার ন্যায় ক্ষণিক হাসাইয়া, শেষে নিদারুণ যন্ত্রণার অন্ধকারে কাঁদায়। তোমাকেও ধিক্, তাদিগেও ধিক্। লোকে সংসারকে যে দুঃখের মরুভূমি বলে, সে কেবল তোমাদের ন্যায় দ্বিজিহ্ব নারকীদের নরকলীলা দেখিয়া।

যাদবেন্দ্র মলিনমুখে, শূন্যবুকে, দারুণ অসুখে, গন্তব্য পথের অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার সেই শোচনীয় মূর্ত্তিখানি দুই চক্ষে দেখিলে, ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে না বলিয়া, বিশাল আকাশ যেন নক্ষত্ররূপ লক্ষ লক্ষ চক্ষু মেলিয়া, নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া দেখিতে লাগিল। তমসাচ্ছন্ন পাদপশাখে ঝিল্লী-কুল ঝিঁ ঝিঁ করিয়া, কি একটা একটানা শব্দ করিতে লাগিল। বৈশাখী যামিনী, তাই মলয় সমীর সুধীর সঞ্চরণে, কখন ফুলটি, কখন ফলটি, কখন ডালটি, কখন বা পাতাটি নাড়িতে লাগিল। ঝিল্লীকুল এবং মলয় সমীর, বোধ হয়, হতাশ যাদ-

বেন্দ্রকে আশ্বাস দিবার জন্য এইরূপ করিতে লাগিল। যাদবেন্দ্র কিন্তু নৈরাশ্যের তাড়নায় এখন অন্ধ ও বধির, সুতরাং বেচারা চক্ষু থাকিতেও কিছুই দেখিতে পাইল না—কর্ণ থাকিতেও কিছুই শুনিতে পাইল না। আপন মনে হতাশ প্রাণে সম্মুখভাগে পদক্ষেপ করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে রজনীর অন্ধকার ঘুচিল, কিন্তু যাদবের হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচিল না, বরং বাড়িল। রাত্রির অন্ধকারে তার বিষণ্ণ মুখচ্ছবি বড় কেউ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু প্রভাতালোকের প্রভায় সকলেই বিষণ্ণ মুখ দেখিল, অবসন্ন বুক দেখিল। কাজেই অসুখের উপর চতুর্গুণ অসুখ বাড়িল। এইবার যাদবেন্দ্র বিশ্রামের জন্য একটি স্থানের অন্বেষণে অন্য দিকে যাইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী।

মধুসূদনপুরের দোকানে ধনেশ্বরের ধনলুণ্ঠন ও ভয়ঙ্কর ডাকাতির কথা চারিদিকে রাষ্ট হইয়া গিয়াছে। ধনেশ্বর ডাকাত ধরিবার ও অপহৃত টাকার তোড়াগুলি পুনঃ পাইবার আশায় তাৎকালিক ইংরেজরাজের ফৌজদারীতে বিধিমত চেষ্টা করিল। ফৌজদারীর মাজিষ্ট্রেট হুকুম জারি করিলেন। চারিদিকে চর গোয়েন্দা ঘুরিতে লাগিল, থানায় নুটিশ জারি হইল, দারোগা প্রভৃতিরা তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু ডাকাতির কিছুই কূল কিনারা করিতে পারিল না।

মধুসূদনপুরের দোকানগুলিতেও যথাবিধি তদন্ত করা হইল। আশে পাশে, গ্রাম গ্রামান্তরে চেষ্টার ত্রুটি হইল না, কিন্তু আসল কাজে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" হইয়া দাঁড়াইল।

ডাকাতির দুই তিন দিন পরে সেই দোকানদারটি দোকানে কেনা বেচা করিতেছিল। কিন্তু

খরিদ্দারকে আশামত জিনিষ দিতেও পারিতেছিল না, অর্থাভাবে পাইকারদের নিকট হইতে জিনিষ কিনিতেও পারিতেছিল না। একে দরিদ্রের স্বল্প পুঁজি, তা যদি নষ্ট হয়, তবে আর রক্ষা থাকে না। গরীব দোকানদার বিষম কষ্টেই পড়িয়াছিল। পয়সা আনিয়া খরিদ্দার ফিরিয়া যায়, দোকানদারের চক্ষের উপর ইহা বড় অসহ্য হইল।

এমন সময়ে যাদবেন্দ্র রায় সেই দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দোকানদার ডাকাতির রাত্রে যাদবেন্দ্রকে নিজ দোকানে দেখিয়াছিল। এখন দেখিয়া, প্রথম দেখায় না হউক, খানিকক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিল। চিনিতে পারিয়া বলিল, "মশায়, এসেচেন, ভালই হল। সংবাদ কি বলুন দেখি? আপনি এত বিমর্ষ কেন?"

যাদবেন্দ্র মনের ভাব চাপা রাখিয়া, দোকানদারকে বলিল, "যে সংবাদ তুমি জান্তে চাচ্চ, তারই জন্য আমি বিমর্ষ। তোমার দোকানে আমার মনিবের অত টাকা ডাকাতে লুটে নিয়ে গেলো, মনিব মহাশয় তাই শুনে বড় দুঃখিত হয়েচেন। তাঁর দুঃখই আমার বিমর্ষতার কারণ।"

দোঁকানদার এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইল। বলিল, "তা সত্যি, মশায়! ডাকাতের খর্পরে পোড়ে আমারও যা কিছু ছিল, তাও লুটপাট হয়ে গেচে। টাকা গেলে যে কি কষ্ট হয়, তা যার যায়, সেই বোঝে। তা আর ভেবে কিই বা হবে। সকলি ভগবানের ইচ্ছে।" এই বলিয়া আবার বলিল, "এখন এখানে একটু জিরুবেন কি?"

যা। হাঁ একটু বিশ্রাম কোর্‌বো।

দো। বেশ বেশ। আসুন, বসুন। ওরে ফোট্‌কে! ও ধারে একখানা সপ্ বিছিয়ে, হুঁকো ফিরিয়ে বাবুকে তামুক দে।

যা। আমি তামাক খাইনে।

দো। বেশ কোরেচেন। ও ছাই না খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। (ফোট্‌কের প্রতি) ওরে, বাবুকে তবে শুধু সপ্ দিয়ে, খপ্ কোরে আমাকে এক ছিলিম তামুক দে।

ফোট্‌কে একটি দশমবর্ষীয় বালক। দোকান-দারের নিকটে খাটিত খুটিত এবং যাত্রীদের নিকট দুই চারিটা পয়সা পাইত। যে দিন দোকানে যাত্রীদের শুভাগমন হইত না, সে দিন দোকান-

দার তাকে দুই কুণিকা মুড়ি, এক কুণিকা মুড়কি ও একটি পয়সা দিত।

দোকানদারের নাম জনার্দ্দন মোদক। ফটিকচন্দ্র জনার্দ্দনের অনুমতিক্রমে কার্য্য নির্ব্বাহ করিল। যাদবেন্দ্র সপের উপর উপবেশন করিল। জনার্দ্দন ভুড়ুৎ ভুড়ুৎ করিয়া গুড়ুক টানিতে লাগিল। কিয়ৎকাল কাটিয়া গেল।

দোকানের সম্মুখের পথ দিয়া নানাবিধ লোক গতায়াত করিতে লাগিল। এমন সময়ে "বোম ভোলানাথ" বলিয়া একটি সন্ন্যাসী জনার্দ্দনের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী আবার বলিল, "বাবা! তেরা মঙ্গল হোগা। সাধু সন্ন্যাসীকো কুছ্ ভিচ্ছা দে, বাবা!"

সন্ন্যাসীর প্রার্থনা শুনিয়া দোকানদার বলিল, "ঠাকুরজী! সে দিন ডাকাত পোড়ে আমার সব লুটপাট করা হ্যায়। আমি ভারি দুঃখিত হুয়া হ্যায় যে, আপকো কিচ্ছু দিতে পারতা নেহি হ্যায়।"

সন্ন্যাসী জনার্দ্দন মোদকের মুখে আগ্রহের সহিত সমস্ত ব্যাপার শুনিল। শুনিয়া অত্যন্ত

দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর মস্তকে দীর্ঘজটাজূট। তন্মধ্যে কতকগুলি পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান, কতকগুলি কুণ্ডলী আকারে মস্তকোপরি মণ্ডলীকৃত। আপাদমস্তক ভস্মাচ্ছাদিত। গলদেশে, বাহুমূলে ও মণিবন্ধে রুদ্রাক্ষের মালা বিজড়িত। একখানি শার্দ্দূলচর্ম্ম পরিহিত ও আর একখানি বামকুক্ষিতে পরিচাপিত। বামহস্তে একটি তুম্বী এবং দক্ষিণ হস্তে লোহার দীর্ঘ চিম্‌টা। গলদেশে ভস্মলেপিত যজ্ঞসূত্র। সন্ন্যাসী পরম যোগী। বাহিরের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, ভিতরে তার কুভাব নাই।

অনন্তর আগন্তুক সন্ন্যাসী জনার্দ্দনকে বলিল, "বাবা! ভগবান্‌কি খেল্‌ হ্যায়! হাম্‌ তুম্‌ আপ্‌সোস্‌ কর্‌কে ক্যা কঁরেঙ্গে?"

জনার্দ্দন বলিল, "ঠাকুরজী! ও কথা ঠিক্‌ হ্যায়, কিন্তু আমি গরীব মানুষ হ্যায়, দোকানপাট বা বন্ধ কোর্ত্তে হোগা হ্যায়।"

সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়া বলিল, "অচ্ছা, বাবা! কুছ্‌ ভাওনা চিন্তা মৎ কর্‌। নারায়ণকো এক মন্‌সে চিন্তা কর্‌। তেরা ভালা হোয় গা।" এই

বলিয়া সন্ন্যাসী জনার্দ্দনের মুখের দিকে ক্ষণকাল নিশ্চলচক্ষে চাহিয়া রহিল। তার পর বলিল, "বাবা! তেরা ললাটপট্ বড়া ভালা হ্যায়। ধনলাভকা রেখা দেখা যাতা হ্যায়।"

ভাগ্যে ধনলাভ আছে শুনিয়া জনার্দ্দন তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "গোঁসাই ঠাকুর! আপ্‌নি গুণ্‌তে জান্তা হ্যায়?"

স। হাঁ, বাবা, জান্তা হুঁ।

জ। তবে দয়া কোরে গুণে বলুন, কবে ধনলাভ হবে।

স। নীচে উতর আও।

জনার্দ্দন তাড়াতাড়ি দোকানমঞ্চ হইতে নামিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ দূর হইতে তার কপাল দেখিল। তার পর হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবা! মেরা উপর তেরা বিশ্বোয়াস্ হ্যায়?"

জনার্দ্দন প্রণাম করিয়া বলিল, "হাঁ সন্ন্যাসী ঠাকুর, খুব হ্যায়।"

সন্ন্যাসী। ঠিক্ বোল্‌তা?

জনা। ঠিক বোল্‌তা।

সন্ন্যাসী। অচ্ছা। তুম্ আভি যায়কে তুমারা এহি গাঁওকা কিনারেমে যো শিউমন্দির হ্যায়,উস্‌কা পিছে যো বড়া পিপল্‌কা পেড়্ * হ্যায়, উস্‌কা দচ্ছিন তরফ্, মূলসে তিন হাত তফাৎমে মট্টি উখাড়কে দেখো।"

এই কথা শুনিয়া জনার্দ্দন যার পর নাই পুলকিত হইল। দৈবধন পাইবে, ইহা শুনিলে ও জানিলে জনার্দ্দন তো জনার্দ্দন, চৌদ্দ ভুবন আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠে। জনার্দ্দন সন্ন্যাসীকে বলিল, "আপনিও দয়া কোরে আসুন। জায়গাটা যদি না ঠিক্ কোত্তে পারি, গুণে দেখিয়ে দেবেন।"

সন্ন্যাসী সম্মত হইল।

অনন্তর সন্ন্যাসীকে লইয়া জনার্দ্দন দৈবধন উদ্ধার করিতে চলিল। যাদবেন্দ্র এতক্ষণ বসিয়া সন্ন্যাসিজনার্দ্দনসংবাদ শুনিতেছিল। তাহারও কৌতূহল হইল। সুতরাং সেও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কেবল জনার্দ্দনের আদেশে ফটিকচাঁদ দোকান ঘর আগলাইয়া রহিল।

* পিপল = (সংস্কৃত পিপ্পল) অশ্বত্থ, পেড় = বৃক্ষ। অশ্বত্থবৃক্ষ।

যথা সময়ে তিন জনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইল। সন্ন্যাসীর গণনা সত্য হইল। জনার্দ্দন মোদক মাটি খুঁড়িয়া একটি খুরীতে মুখঢাকা মাটীর ভাঁড় পাইল। খুরি খুলিয়া দেখিল, এক ভাঁড় টাকা। আহ্লাদে বিভোর হইয়া গণিয়া দেখিল এক শত টাকা। জনার্দ্দনের সন্ন্যাসিভক্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। ভাবিল, আবার একবার কপাল-গণাই, হয় তো আরও কোথাও ভাঁড়ভরা টাকা পাইব। এই ভাবিয়া সন্ন্যাসীকে যোড়হস্তে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া বলিল, "গুরুজী! আপনি দেবতা হ্যায়, সাক্ষাৎ এই বুড়া শিব ঠাকুর হ্যায়।" এই বলিয়া শিবমন্দিরের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল।

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে বলিল, "নেহি, বাবা! হাম্ শিউ নেহি হ্যায়, ভগবান্ শিউকো কিঙ্কর হ্যায়। যাও বাবা, ঘর যাও।

জনার্দ্দন আগ্রহের সহিত বলিল, "ঠাকুরজী! আর একটি নিবেদন আছে।

স। ক্যা?

জ। আর একবার আমার কপালটা যদি গুণে দেখেন।

স। আর তেরা কপালমে ধনরেখা নেহি মিল্‌তা হ্যায়।

জ। তবু একবার।

সন্ন্যাসী এবার বিরক্ত হইলা বলিল, "আরে লোভী! এসা লালচ কেঁও কর্‌তে হো? তেরা ভাগমে যো থা, ওহি মিলা হুআ হ্যায়। লোভ কর্‌নেসে এক মুঠ্‌ঠি ধূলি ভি নেহি মিল্‌তা হ্যায়। যাও ঘর যাও।

জনার্দ্দন সন্ন্যাসীর মুখভাব দর্শন ও বাক্যভাব শ্রবণ করিয়া, কিঞ্চিৎ ত্রস্ত হইল। আর কিছু না বলিয়া, দণ্ডবৎ করিয়া নিজের দোকানে চলিয়া গেল।

সন্ন্যাসী "বোম্ ভোলানাথ" বলিয়া অন্য দিকে যাইতে লাগিল। কিছু দূর যাইয়া অকস্মাৎ পশ্চাৎ দিকে পদবিক্ষেপের শব্দ শুনিয়া, মুখ ফিরাইল। দেখিল, একটি যুবা তাহার পশ্চাতে আসিতেছে। সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসিল, "বেটা! তুম্ কোন্ হ্যায়?"

যুবা উত্তর করিল, "যাদবেন্দ্র রায়।"

সন্ন্যাসী বলিল, 'তুম্ আভি ওহি দুকান্‌মে আউর পিপল্‌কা পেড়কা লগে থা নেহি?"

যাদবেন্দ্র উত্তর করিল, "হাঁ প্রভুজী!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুরু ও শিষ্য।

মধুসূদনপুর গ্রামের উপকণ্ঠে শিবমন্দির, তার পর মাঠ। সন্ন্যাসীর সঙ্গে মাঠে যাদবেন্দ্রের ঐ কথা হইল।

অনন্তর সন্ন্যাসী যাদবেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া মাঠের মধ্যস্থ একটা কপিত্থ বৃক্ষমূলের ছায়ায় গিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, "বচ্চা! কাহে তুম্ মেরা পাছ পাছ আওতা হ্যায়?"

যা। আপনার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে।

যা। ক্যা? বোলো।

যা। আমি আপনার শিষ্য হতে প্রার্থনা করি।

স। (সহাস্যে) কেঁও বাবা! এয়সা ইচ্ছা কাহে করো? সংসারীকা সন্ন্যাসীকো চেলা হোনা অচ্ছা নহি। পুত্র পরিবার ধন জন ছোড়্‌কে কেঁও কষ্ট-সাগরমে ডুবো গে?

যা। প্রভু! আমার স্ত্রীপুত্র নাই।

স। তুমারা স্ত্রীপুত্র ক্যা মর্ গেয়া ?

এবার যাদবেন্দ্রের বাক্‌রোধ হইল, নয়নযুগল অশ্রুভারে উথলিয়া উঠিল। যুবা কাঁদিয়া ফেলিল।

তদ্দর্শনে সন্ন্যাসী ব্যথিত হইল এবং সান্ত্বনা-বাক্যে বলিল, "বচ্চা! রোয়কে ক্যা করোগে ? সভি নারায়ণ কি ইচ্ছা। মেরা বচন শুনো, রোও মৎ।"

যাদবেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না। মুখ ফুটিয়া সাশ্রুনয়নে বলিল, "প্রভু! আমার স্ত্রীপুত্র মরে নাই।"

স। তব্ কেঁও রোতা ?

যা। আমার বিবাহই হয় নি।

স। তব্ তো আউর ভালা। কেঁও খালি খালি রোয়কে কষ্ট ভোগ কর্‌তে হো ?

যা। ঠাকুর! সাধ কোরে কি আজ চোখের জল ফেল্‌চি। আমার মত হতভাগ্য পুরুষ আর কেউ নেই।

এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীর মনে কি এক চিন্তার উদয় হইল। কিসের জন্য যুবা কাঁদিতেছে, কি এমন তাহার বিপদ ঘটিয়াছে, কিসে বা তাহার

মনোভঙ্গ হইয়াছে, বিশেষ করিয়া জানিবার জন্য সন্ন্যাসীর মনে অতিশয় কৌতূহল হইল। নিতান্ত ব্যগ্রতার সহিত যাদবেন্দ্রকে বলিল, "বাবা! তুমারা ক্যা হুয়া হ্যায়, সব মুঝকো জল্‌দি খোল্‌খাল্‌ বোলো তো।"

তখন যাদবেন্দ্র, ধনেশ্বর ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী নির্ব্বাক্ হইয়া শুনিতেছিল। যেমন যাদবেন্দ্রের কথা শেষ হইল, অমনি তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল, "লড়্‌কা! মেরা উপর তেরা বিশ্বো-য়াস হ্যায়?"

যাদবেন্দ্র সন্ন্যাসীর পদযুগল স্পর্শ করিয়া বলিল, "হাঁ, প্রভু! আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার অচল বিশ্বাস আছে। আমি স্বচক্ষে এই কতক্ষণ আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখেছি। আপনি সামান্য মানুষ নন, আপনি দেবতা।"

সন্ন্যাসী বলিল, "বেটা! মেরা উপর তেরা বিশ্বোয়াস্ হুআ হ্যায় তো এক কাম কর্।"

"আজ্ঞা করুন্" বলিয়া যাদবেন্দ্র সন্ন্যাসীর পদত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "তুম্ যো মেরা চেলা হোনে কা ইচ্ছা পর্‌কাশ কিয়া থা, উহ ইচ্ছা কার্য্যমে ঠিক্ কর্‌নে কো শকোগে ?"

যা। হাঁ, প্রভু। আমি আপনার শিষ্য হব।

স। বিবাহ কা ইচ্ছা একদম্ ছোড়্‌নে শকোগে ?

যা। বিবাহের ইচ্ছা পূর্ব্বেই ছেড়েছি। চির-জীবন আমি কুমারাবস্থায় থেকে আপনার শিষ্য হোয়ে আপনার চরণসেবা কর্‌বো।

স। তব্ মেরা সঙ্গ্ আও।

বাস্তবিক, যাদবেন্দ্র নিজের অবস্থা ভাবিয়া, লোকচরিত্রের ছলনা বুঝিয়া, লোকসমাজের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া, মনুষ্যজিহ্বার চাতুরীপূর্ণ বাক্য শুনিয়া, সাধারণ লোকের সহিত মিশিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিল। নির্জ্জনে একাকী থাকিতে বা কোন সাধু সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া, জীবন কাটাইতে মনন করিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে তার সে আশা পূর্ণ হইল। আজ

যাদবেন্দ্র সন্ন্যাসীর শিষ্য। আজ সে বিবাহের শত্রু ও চিরকৌমার্য্যের বন্ধু।

অনন্তর সন্ন্যাসী যাদবেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বরাবর কোথায় যাইতে লাগিল। অনবরত হাঁটিয়া চার পাঁচ ক্রোশ দূরে একটি ক্ষুদ্র নদীতটে উপনীত হইল। সেখানে একটি ঘাটের উভয় পার্শ্বে ছয়টি করিয়া বারটি শিবমন্দির স্থাপিত ছিল। মন্দিরগুলির অবস্থা দেখিয়া বোধ হইত, তাহাদের বয়স এক শত বৎসরের কম ছিল না।

সন্ন্যাসী সেই স্থলে গিয়া, যাদবেন্দ্রকে নদীতে স্নান করিতে বলিল। যাদবেন্দ্র স্নান করিল। স্নানের পর সন্ন্যাসী ঠাকুর যাদবেন্দ্রের মস্তকে শিবের প্রসাদী ফুল দিয়া যথাবিধানে শিষ্যত্বে বরণ করিল। যাদবেন্দ্র ভক্তিভরে গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিল।

তার পর সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাকে বলিল, বেটা! অব্ তোম্ এক কাম করো। হাম্ ভিচ্ছা কর্‌কে দো তিনঠো রুপেয়া জমা কিয়া হ্যায়। তোম্ লেও। ইস্‌মেসে খরচ উরচ কর্‌কে ভোজন উজন করো। এই মন্দিরমে রহো। থোড়া দূর

এক গাঁও হ্যায়, উস্‌কা নাম চণ্ডীবাটী। উহাঁ বাজার আউর দোকান হ্যায়। যো দরকার হোগা উহাঁসে মোল্ লাও। আজ হাম্ দুস্‌রা জাগামেঁ যাউঙ্গা।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী তুম্বীর ভিতর হইতে একখানা নেকড়ায় বাঁধা তিনটি টাকা যাদবেন্দ্রের হস্তে দিল।

যাদবেন্দ্র টাকা লইয়া বলিল, "আপনি কোথা যাবেন?"

স। আজ তপস্যা কর্‌নেকো যাউঙ্গা। কল্‌কের দু পহর কো আউঙ্গা। তোম্ আজ্ রাৎমে এই মন্দিরকে ভিতর শো রহো।

"যে আজ্ঞে" বলিয়া যাদবেন্দ্র গুরুকে প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

এক্ষণে যাদবেন্দ্রকে আমি একটা কথা বলি, যাদবেন্দ্র! যে সন্ন্যাসীর তুমি শিষ্য হইলে, এ সন্ন্যাসী সাধারণ লোক নয়। তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি, এ সন্ন্যাসী সেই ভীমভাম। ঈশ্বর তোমাকে অকূলপাথারের কাণ্ডারী মিলাইয়া দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভীমভামেব প্রতিজ্ঞা।

নবীন শিষ্য যাদবেন্দ্রকে শিবমন্দিরে রাখিয়া চতুর সন্ন্যাসী ওরফে ভীমভাম বরাবর ভগ্ন মস্‌জিদে চলিয়া গেল। এমনি কৌশলময় বেশ-ভূষা, এমনি কৌশলময় কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন যে, বিশেষ পরিচিত লোকেরাও ভীমভামকে প্রকৃত সন্ন্যাসী ব্যতীত ভীমভাম বলিয়া চিনিতে পারিত না।

সন্ন্যাসী যথাসময়ে মস্‌জিদারণ্যে প্রবেশ করিল। বনরক্ষক দস্যুরা এক জন অপরিচিত সন্ন্যাসীকে বনপ্রবিষ্ট দেখিয়া, তাহার গতিপথ রোধ করিল। বলিল, "তুমি কে?"

"সন্ন্যাসী।"

"এখানে কি দরকার?"

"কুছ্ নেহি।"

"তবে কেন জঙ্গলে ঢুকেছ?"

"তপ্ করনেকা ওয়াস্তে একঠো নির্জ্জন স্থান ঢুঁড়তা হুঁ।"

এই কথা শুনিয়া দস্যুদের মনে সন্দেহ জন্মিল। সন্ন্যাসী একবার বলিল, 'এখানে কিছু দরকার নাই।' আবার বলিল, 'তপ করবার জন্য একটা নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিতেছি।' এক জিহ্বায় এক পলকে দুই কথা, সুতরাং ডাকাত-দের মন সন্দিগ্ধ হইবে না তো কি?

তৎক্ষণাৎ তাহারা, সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিল। এক জন দস্যু দৌড়িয়া গিয়া মসজিদে সংবাদ দিল। দেখিতে দেখিতে স্বরূপ, পাঁচু প্রভৃতি দস্যুরা ধৃত সন্ন্যাসীর নিকট ছুটিয়া আসিল। একটা কোলাহল উঠিল।

তখন সন্ন্যাসী যেন কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল, "ম্যায় ক্যা ডাঁকু হ্যায়?"

স্বরূপ অনিমেষ চক্ষে সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক পরীক্ষা করিতেছিল। সে সন্ন্যাসীর এই কথা শুনিয়া, কি একটা চিহ্ন দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপ ক্যা বোল্‌তা থা, ঠাকুরজী?"

সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার বলিল, "ম্যায় ক্যা ডাঁকু হ্যায়?"

"আপ ডাঁকুকা সর্দ্দার হ্যায়!" বলিয়া স্বরূপচাঁদ

উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিল। পরে আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "এত ঢং‌ও তুমি জান, ভীম!"

এই বলিয়া স্বরূপ স্বহস্তে সন্ন্যাসীর জটাজূট কাড়িয়া লইল, বাঘছাল খুলিয়া দিল, মুখের ভস্ম মুছিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই সন্ন্যাসী হইল—ভীম-ভাম!

বড় একটা হাসির তরঙ্গ উঠিল। বনান্তরালে প্রতিধ্বনির মুখেও সেই হাস্য-তরঙ্গ ফুটিল। ডাকাতদের মধ্যে অনেকে অবিচ্ছেদে এত হাসি হাসিতে লাগিল যে, শেষে কাসিতে কাসিতে পেটে ও মাথায় ব্যথা ধরিল, মুখ রাঙা হইল। তার পর সকলে ভীমভামকে লইয়া মস্‌জিদে আসিল। ভীমভাম জলে আচ্ছা করিয়া দেহ ধৌত করিল, গামোছায় উত্তম করিয়া গা মুখ মুছিল।

অনন্তর দোকানদারকে কি কৌশলে এক শত টাকা দেওয়া হইল, ভীমভাম সকলকে সে কথা বলিল। সকলে তাহার বুদ্ধিকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিল। তার পর ভীমভাম, যাদবেন্দ্রের কথা পাড়িল। সকলে আদ্যোপান্ত শুনিয়া তুষ্ট হইল। শেষে হাসিতে হাসিতে স্বরূপ বলিল,

"ভাই ভীম! তুমি তো সন্ন্যাসী সেজে এক দিনেই এক চেলা কোরে এলে। মাস খানেক সন্ন্যাসীর বেশে থাক্‌লে, না জানি কত শত চেলা জুটুবে।" এই বলিয়া আবার বলিল, "তা তোমার পক্ষে এ বড় আশ্চর্য্যির কথা নয়। তুমি বিন সন্ন্যাসীর সাজেই যখন আড়াই শো, তিন শো চেলা জুটিয়ে মস্‌জিদের জঙ্গল গুল্‌জার কোরেচো,— তখন মনে কোল্লে এক এক সাজে কত লোককে যে নিজের অধীন কোত্তে পারো, তা বলাই বাহুল্যি। ভাই ভীম! তুমি কি কিছু মন্তর তন্তর জান? ভোজ ভেল্কি জান?"

ভীম ভাম হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "স্বরূপ দাদা! আমার মন্ত্র তন্ত্র ভোজ ভেল্কি তোমরাই।"

অনন্তর দস্যুদলের মধ্যে যে কয় জন ব্রাহ্মণ ছিল, তাহারা ভীমভামের আহারের আয়োজন করিয়া দিল। ভীমভাম আহারে বসিবার পূর্ব্বে সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের সকলের খাওয়া দাওয়া চুকে গেচে তো?"

স্বরূপ বলিল, "তোমার তো হুকুম আছে যে,

যদি তোমার আস্তে দেরি হয়, তবে সকলে যেন খাওয়া দাওয়া কোত্তে অপেক্ষা না করে। তুমি তো ভাই সূয্যি ডুবিয়ে এলে। কাজে কাজে——”

“বেশ কোরেচো খেয়েচো। যে নির্ব্বোধ, সেই খালি পেটে থাকে।” এই বলিয়া ভীমভাম আহার করিতে আরম্ভ করিল। যথা সময়ে ভোজন-ব্যাপার সমাপ্ত হইল।

আহারান্তে তামাক টানিতে টানিতে ভীমভাম স্বরূপ প্রভৃতিকে নিকটে বসাইয়া একটা বিশেষ কথার অবতারণা করিল। ভীম ভাম বলিল, “স্বরূপ দাদা! আমি মনে মনে একটা গুরুতর প্রতিজ্ঞা কোরেচি। সে প্রতিজ্ঞা পূরণ কোত্তে হবে। কিন্তু তোমরা সকলে সে বিষয়ে আমার সাহায্য না কোল্লে, আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবে। তোমাদের সাহায্য চাই।”

স্বরূপ বলিল, “কি পর্‌তিজ্ঞে, ভাই?”

“যে যুবা যাদবেন্দ্রকে আমি শিষ্য কোরেচি, তার মনের কষ্ট দূর করা।”

“তার মনে কি কষ্ট হয়েচে?”

"তাকে এক জন দুরন্ত লোক এক প্রকার পাগল কোরেচে।"

"কে সে দুরন্ত লোক?"

"ধনেশ্বর সিংহ রায়।"

এই কথা শুনিয়া স্বরূপ প্রভৃতি দস্যুরা বিস্মিত হইল। স্বরূপ সাগ্রহে বলিল, "কে? ধনেশ্বর সিংহ রায়? যে রাক্ষসের টাকা লুট কোরেছি, সেই ধনেশ্বর?"

"হাঁ, স্বরূপ!"

"সে তোমার চেলাকে কি এমন কষ্ট দিয়েচে, শীগ্‌গির বল। এখনি তার দাদ তুল্‌বো। তোমার চেলাকে কষ্ট দেয়, কার এমন ঘাড়ের উপর মাথা? চোঁড়া হোয়ে কেউটের সঙ্গে বাদ!"

"ধনেশ্বর সিংহ রায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরেচে—সামান্য ধনের লোভে ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরেচে—প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের সঙ্গে তার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার প্রাণদাতা যাদবেন্দ্রের হৃদয় ভঙ্গ কোরেচে। স্বরূপ! বেশী বোল্‌বো কি, ধনেশ্বরের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ভীমভামের প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি কোরেচে।" এই

বলিতে বলিতে ভীমভামের রূপান্তর ও ভাবান্তর ঘটিল। ভীম যেন সাক্ষাৎ ভীম হইয়া দাঁড়াইল।

ভীম ভামের সেই রোষকষায়িত চক্ষু, দশন-দংশিত অধর ও রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া স্বরূপ মনে মনে বলিল, "নিতান্ত অত্যেচার না হোলে, ভীম কথনো এমন মূর্ত্তি ধরে না।" অনন্তর প্রকাশ্যে বলিল, "ভীম! ধনেশ্বর কি পরতিজ্ঞে ভঙ্গ কোরে তোমার মনে এমন ভয়ঙ্কর আগুন জ্বেলে দিয়েচে?"

তখন ভীমভাম ধনেশ্বরের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। স্বরূপ প্রভৃতি দস্যুরা শ্রবণ করিয়া ধনেশ্বরের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ও যাদবেন্দ্রের প্রতি মর্ম্মের করুণা প্রকাশ করিতে লাগিল।

তাহাদের ঘৃণা ও করুণার ভাবনা না থামিতে থামিতে ভীম ভাম বলিল, "শোনো, স্বরূপ! আমার প্রতিজ্ঞা;—ধনেশ্বর যেমন দীনহীন যাদবেন্দ্র রায়কে আশায় বঞ্চিত কোরেচে, তাকে তেমনি উপযুক্ত প্রতিফল দিয়ে আশায় বঞ্চিত কোত্তে হবে।"

স্বরূপ উত্তর করিল, "কিরূপ প্রতিফল ?"

ভীম ভাম বলিল, "ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে সরল যাদবেন্দ্রের হস্তে অর্পণ কোর্‌বো।"

এই কথা শুনিয়া স্বরূপ প্রভৃতি অত্যন্ত আনন্দিত হইল। "উপযুক্ত প্রতিফল, ঠিক প্রতিফল" বলিয়া সকলে প্রধান সুর্দ্দারের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর স্বরূপ বলিল,

"কবে তুমি এ শুভ কর্ম্মটা কোত্তে মৎলব কোরেচো ?"

"এই বৈশাখ মাসের আঠাশে তারিখে ধনেশ্বর অপর এক জন ধনীর পুত্রের সহিত সরলার বিবাহ দেবে।, আমি যাদবেন্দ্রের মুখে শুনেচি, ধনেশ্বর এই বিবাহে অনেক টাকার গহনা পাবে। তা ছাড়া, সেই ধনীর আর পুত্র নাই। সুতরাং ধনেশ্বর, বৈবাহিক অবর্ত্তমানে জামাতার ধনদৌলত নিজেই তদারক কোরবে। স্বরূপ! তা হলেই বুঝেচো, সময়ে কি দাঁড়াবে ?"

স্বরূপ সহাস্যে বলিল, "ধনী জামাই গরীব হবে। আমি অনেক লোকের মুখে শুনেচি এবং চোকেও দেখেচি, এমন ঘটনা ঢের ঘটে।"

ভীম ভাম বলিল, "সুতরাং ধনেশ্বরের ধন-লোভ নষ্ট কোরে এবং তাকে জব্দ কোরে যাদবেন্দ্রকেই তার জামাই কোর্‌বো। আজ থেকেই তার বিহিতরূপে আয়োজন কর। আমাদের দলে আড়াই শো তিন শো মাত্র লোক আছে। কিন্তু অন্ততঃ হাজার লোকের প্রয়োজন। অতএব যে টাকা মাটিতে গেড়ে রেখেচি, সেই টাকা এইবার কাজে লাগ্‌বে। তোমরা আজ থেকেই সেই টাকার সাহায্যে আরো সাত আট শো বলিষ্ঠ ও চতুর ডাকাত সংগ্রহ কর, অস্ত্র শস্ত্রের যোগাড় কর।"

স্বরূপ। আচ্ছা। তার পর?

ভীম। তার পর যা যা কোত্তে হবে, এর পর বোল্‌বো। এখন আর একটা কথা বলি। তোমরা কেউই যাদবেন্দ্রের কাছে যেও না বা তাকেও এখানে এনো না। খুব সাবধান, সে যেন কোন মতে জান্তে না পারে যে, আমরা ডাকাত। আমি যে তার গুরু, সন্ন্যাসী, এ ভাব যেন তার মন থেকে না নড়ে। কেবল আমিই তার সঙ্গে সন্ন্যাসি-বেশে দেখা সাক্ষাৎ কোর্‌বো।"

স্বরূপ বলিল, "তোমার কথা আমরা কি কখ-

নও লঙ্ঘন করি? তুমি আমাদের যা বোল্‌বে, আমরা তাই কোর্‌বো।”

এইবার পাঁচু বলিল, “আচ্ছা, বড় সর্দ্দার! তুমি তোমার নতুন চেলার সঙ্গে ধনেশ্বরের মেয়ের যে বে দেবে, সে কথা তাকে বোলেচো?”

ভীমভাম উত্তর করিল, “না, বলিনি। বোল্‌বও না। আমার মৎলব মত কাজ কোর্‌বো।”

এ সকল কথোপকথনে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তখন ভীম ভাম সকলের নিকট বিদায় লইয়া কপিলপুরে নিজ কুটীরে প্রস্থান করিল। ভীমভাম দ্রবময়ীকে এ সকল কথা বলিবে কি? জানি না।

নবম পরিচ্ছেদ।

শিষ্যের পরিচয়।

পর দিন প্রাতে বেলা এক প্রহরের অল্পক্ষণ পরেই নূতন শিষ্য যাদবেন্দ্রের নিকট গুরুদেব সন্ন্যাসী ঠাকুর উপস্থিত হইলেন।

যাদবেন্দ্রের গত রাত্রে নিদ্রা হইয়াছিল কি না, তাহা জানি না। কিন্তু প্রাতঃকালে স্নানাদি সারিয়া, এক একটি করিয়া, দ্বাদশটি শিবের মস্তকে নদীজল ও বিল্বদল দিল। গত কল্য চণ্ডীবাটীর এক জন কাংস্যকারের নিকট হইতে একটা পিতলের বড় ফাঁপা ঘটী, একটি ছোট তামার ঘটী এবং একটি তামার ছোট পুষ্পপাত্র ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। তামার ঘটীতে নদীজল এবং তামার পুষ্পপাত্রে ফুল বিল্বদল, আতপ তণ্ডুল, কাঁঠালীকলা ও বাতাসা পূর্ণ করিয়া, যাদবেন্দ্র অদ্য প্রাতে শিবপূজা সারিয়াছিল। তার পর, দ্বাদশটি মন্দিরের মধ্যে শেষটিতে বসিয়া এখন পর্য্যন্ত শিবের আরাধনা করিতেছিল। যাদবেন্দ্র শিবপূজার মন্ত্র বা স্তোত্র

জানিত না। "বোম মহাদেব! হর হর বোম!" বলিয়া হরপূজা করিয়াছিল। এখন শেষ মন্দিরটির মধ্যে বসিয়া আপন মনে শিবের নামগান করিতেছিল। যাদবেন্দ্র বেশ সুকণ্ঠ, মিষ্ট সুরে গান করিতে পারিত। সে টোড়ী-ভৈরবী রাগিণীতে এই গানটি গাহিতেছিল ;—

"ভোলানাথ নাম হে তোমার, পর ভুলিয়ে নিজেও ভোলো।
এ দাসে আজ্ ভোলাও, প্রভু। নৈলে আমার প্রাণ যে গেলো॥
সব ভুলেচি আমি, ভোলা!
একটি যে আর যায় না ভোলা,
তাই ভুলিয়ে, নিবাও জ্বালা,
প্রাণের জ্বালাহারী ;—
ভক্তজনে সদয় হয়ে তোমার দয়ার দুয়ার খোলো॥"

সন্ন্যাসী ধীরপদসঞ্চারে, যাদবেন্দ্রের অলক্ষ্যে মন্দিরপার্শ্ব হইতে স্থির হইয়া, এই গানটি শুনিল। সন্ন্যাসীর হৃদয়ে আঘাত লাগিল। সন্তপ্তচিত্তে মনে মনে বলিল, "বৎস! আর দুঃখ করিও না। ভগবান্ মহাদেবই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ভোলানাথ তোমাকে ভোলাবেন, কিন্তু তুমি যে ভাবে ভুলিতে চাও, সে ভাবে নহে, অন্য ভাবে।

বৎস যাদব! সে ভাব তুমি জান না, আমি জানি। তুমি ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে না দেখিয়া ভুলিতে চাও, কিন্তু দেখিয়া ভুলিবে। বৎস! তুমি কি জান না যে, যে ভোলার কাছে তুমি ভোল্‌বার প্রার্থনা কোচ্চো, সে ভোলা প্রেমের যোগী।”

সন্ন্যাসী এই পর্য্যন্ত মনে মনে বলিয়া, মন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। মন্দিরমধ্যে একটি অস্ফুট ছায়া পড়িল। তদ্দর্শনে গানমগ্ন যাদবেন্দ্র গ্রীবা বক্র করিয়া দেখিল তাহার গুরুদেব দণ্ডায়মান। তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ভক্তিভরে গুরুদেবকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী “মনোবাঞ্ছা পূরণ হোয়” বলিয়া, হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

সন্ন্যাসী দেখিল, এখনও শিষ্যের মুখমণ্ডলে বিষাদের নিবিড় ছায়া ভাসিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। করিলে পাছে আহত যুবা আরো মর্ম্মাহত হয়। তাই সন্ন্যাসী অন্য কথা পাড়িল। বলিল, “বেটা! কল্ ক্যায়সা থা?”

“প্রভু! আপনার আশীর্ব্বাদে ভাল ছিলেম।”

"ভোজন কিয়া থা?"

"করেছি, প্রভু।"

"তুমারা পাশ আউর খরচ উরচ কুছ্ হ্যায়?"

"এই সকল তৈজসপত্র কিন্‌তে ও আহার সামগ্রী কিন্‌তে প্রায় তিন টাকার সমস্ত খরচ হোয়েচে। সাড়ে তিন আনা আছে।"

"আচ্ছা। আজ পাঁচ রুপেয়া লেও। হাম্ তুমারা লিয়ে ভিচ্ছা কর্‌কে লায়া হুঁ।"

যাদবেন্দ্র টাকা গ্রহণ করিল। কিন্তু মনে কি একটা চিন্তা হইল। বলিল, "প্রভু! আপনি প্রত্যহ ভিক্ষা কোরে এত টাকা কোথায় পান?"

চতুর সন্ন্যাসী উত্তর দিল, "মেরা এক জমীদার শিষ্য হ্যায়। ওহি মুঝ্‌কো রুপেয়া দেতা হ্যায়। রুপেয়া মে মেরা কুছ্ দরকার নেহি হ্যায়। ম্যায় এহি সব রুপেয়া দীনদুলিদ্দর লোগোঁকো দে দেতা হুঁ। তুম্ মেরা চেলা হুআ হ্যায়, এহি লিয়ে তুমারা ওয়াস্তে লা চুকা হুঁ।"

অনন্তর সন্ন্যাসী শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া, মন্দিরের কিছু দূরে নদীতটে অবস্থিত একটি পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল। সেখানে একটি কদম্ব বৃক্ষতলে

উপবিষ্ট হইয়া শিষ্যকে বসিতে বলিল। গুরুর কিঞ্চিৎ দূরে শিষ্য উপবেশন করিল।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিল, "আচ্ছা, বেটা! তুমারা পিতা মাতা হ্যায়?"

"প্রভু! পিতার পরলোক হয়েচে। মাতা আছেন।"

"পিতাকা নাম?"

"৺মাধবেন্দ্র রায়।"

"মাতা কি নাম?"

"শ্রীমত্যা মহামায়া দেব্যা।"

"তুমারা নিবাস কাঁহা?"

"কাজার হাট গ্রামে।"

যাদবেন্দ্রের পিতা, মাতা ও বাসস্থানের নাম শুনিয়া সন্ন্যাসী কতকটা চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে কি একটা গভীর চিন্তা আসিয়া উথলিয়া উঠিল। কিন্তু মনের ভাব ও মুখের চমক-ছায়া চাপিয়া, সন্ন্যাসী আবার বলিল,

"আউর তুমারা কোন্ হ্যায়?"

"আমার এক ভগিনী। নাম স্নেহময়ী। শ্বশুরালয় কপিলপুর গ্রামে।"

সন্ন্যাসী পূর্ব্বের পরিচয়েই বুঝিয়াছিল। এই-

বার সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিল। কি বুঝিল? বুঝিল এই—"যাদবেন্দ্র আমার ও আমার পত্নীর পরোমপকারিণী মহামায়ার পুত্র।" বুঝিবার কথাই তো বটে। সন্ন্যাসী তো আর কেহই নয়—সেই ভীমভাম।

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া মনে মনে বলিল, "হরির লীলা বোঝা মানুষের সাধ্য নয়। আজ তাঁর অদ্ভুত-লীলা-নাটকের একটি অঙ্ক অভিনীত হল। এই অঙ্কের 'অভিনেতা 'গুরু ও শিষ্য—'ভীমভাম ও যাদবেন্দ্র।' ধন্য হরি-লীলা! ধন্য অপূর্ব্ব ঘটনা! ধন্য বিচিত্র অভিনয়! আমার পরম মাননীয়া মহামায়ার পুত্র আজ আমারই শিষ্য। ভগবান্ মহাদেব! আজ তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, এই শিষ্যের প্রাণ আমার প্রাণের অপেক্ষাও মূল্যবান। আমার তুচ্ছ প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া, সেই 'উচ্চপ্রাণা' মহামায়ার এই স্নেহের নিধি যাদবেন্দ্রের উপকার করবো।"

সন্ন্যাসী মনে মনে এই পর্য্যন্ত বলিয়া, শেষে স্ফুটিতবচনে বলিল, "বাচ্চা! তুম্ হিন্দী ভাখামে বাৎ চিৎ করনে শক্তে হো?"

যাদবেন্দ্র উত্তর করিল, "পারি, প্রভু!"

সন্ন্যাসী সানন্দে বলিল, "ভালা ভালা।" এই বলিয়া আবার বলিল, "আজ হাম ফের্ নির্জ্জন জঙ্গলমে তপস্যা কর্‌নেকো যাতা হুঁ। কল্ ফের্ আউঙ্গা। তুম্ ইহাঁসে কাহিঁ মৎ যাও। থোড়া রোজমে মেরা তপস্যা হো যায়গা। তব্ তুম্‌কো সাথ্ লেকে বৃন্দাবন যাউঙ্গা।"

শিষ্য গুরুকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিল। গুরুও আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিল।

অদ্ভুত ডাকাত।

তৃতীয় অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুসংবাদ।

মহামায়া এখন কাজীর হাটের নিজ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিল। হঠাৎ বৈশাখ মাসের আটই তারিখে তাহার নিকট সংবাদ আসিল, যাদবেন্দ্র নিরুদ্দেশ। মহামায়া এই কুসংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। সংবাদদাতাকে ব্যাকুলহৃদয়ে বলিল,

"ও বাছা, তুমি বল কি! যাদব আমার কোথা গেল! তোমাদের জমীদার বাবুর বাড়ীতে বা তাঁর কাছারী বাড়ীতে কি নেই?"

সংবাদদাতা বলিল, "না।"

"অন্য কোন জায়গায় কি গিয়েচে?"

"কোন সংবাদ পাচ্চিনি।"

"জমীদার বাবুর সঙ্গে কি তার ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল?"

"তাও না।"

"তবে কোথায় গেল! বাড়ীতেও তো আসে নি।"

সংবাদদাতা বলিল, "এর পূর্ব্বে কবে এসেছিল?"

মহামায়া বলিল, "এক বছরের বেশী হল, আসে নি। পূর্ব্বে আট ন খানা চিটী লিখেছিল। কিন্তু ক'মাস ধোরে তাও লেখেনি।"

"চিটীতে কি লিখেছিল?"

"কুশলসংবাদ। কাজের ঝঞ্ঝাট, তাই বাড়ী যেতে পাচ্চি নি, শীগ্‌গিরী যাব। মাইনে জমা কোরে রাখ্‌চি, যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাব। এই সব কথা।"

"এ ছাড়া অন্য কোন কথা?"

"কই, তা তো মনে হচ্চে না।"

"বিবাহের কথা?"

"বিবাহের কথা? কই না। আমার বেশ মনে

হচ্চে, সে কথা তো একখানিও চিটীতে লেখেনি।”

এই বলিয়া মহামায়া ব্যগ্রতার সহিত বলিল, “হ্যাঁ বাবা! বিয়ে কি বোল্‌চো? সব ভাল কোরে খুলে বল।”

তখন সংবাদদাতা ধনেশ্বর, সরলা ও যাদবেন্দ্র-ঘটিত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। মহামায়া নির্ব্বাক হইয়া শুনিল। শুনিয়া আবার বলিল,

“তুমি এ সকল কথা কি কোরে জান্‌লে?”

“আমার সঙ্গে আপনার পুত্রের বড় বন্ধুত্ব। সে সমস্ত কথা আমাকে বোল্‌তো। আমিও বেলপাড়াব কাছারীতে কাজ করি। আমি আদ্যো-পান্ত সমস্ত জানি।” এই বলিয়া সে নিজের পিরহানের বগ্লী হইতে একখানি পত্র বাহির করিল।

পত্রখানি দেখিয়া মহামায়া শশব্যস্তে জিজ্ঞা-সিল, “ও কিসের চিটী, বাবা?”

সংবাদদাতা পত্রখানি খুলিতে খুলিতে বলিল, “মা গো! এ পত্রখানি আপনার যাদবের। যাদব আমার নামে এই পত্র লিখে, তার বিছানার মাথার বালিশের নীচে রেখে সাম্‌টী গ্রামে গিয়েছিল।”

মহামায়া আকুল-কৌতূহলের সহিত পত্রখানির মর্ম্ম শুনিতে চাহিল। সংবাদদাতা পত্র পড়িতে লাগিল। পত্রে এই লিখিত ছিল ;—

"বন্ধুবর শ্রীযুক্ত লুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়,

প্রীতিভাজনেষু—

ভাই লুট! বেলপাড়ার কাছারী হইতে এই আমার শেষ বিদায়। আমি আজ সামটী চলিলাম। সেখানে মনিব মহাশয়কে পুণ্যাহের সমস্ত টাকা জমা দিয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিব। আর আমার চাকুরি করিবার অণুমাত্রও ইচ্ছা নাই। মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, প্রাণ কাতর হইয়াছে, হৃদয় নিস্তেজ হইয়াছে এবং শরীর অবসন্ন হইয়াছে। কেন যে এমন হইয়াছে, তাহা বিশেষ রূপে অবগত আছ। যে মনিব এক মুখে দুই কথা কহে, যাঁর অন্তঃকরণ পাষাণের অপেক্ষাও কঠিন, যাঁর কার্য্য বাতুলের অপেক্ষাও অতি তুচ্ছ, তাঁর নিকট চাকুরি করা আমার সাধ্য নহে। তিনি ধনী, আমি দরিদ্র, সুতরাং নীরবে প্রস্থান করাই উচিত। তাই, ভাই! নীরবে চলিলাম। কোথায় চলিলাম, তার স্থিরতা নাই ; কারণ আমার মন

অস্থির। তুমি যদি এই পত্রখানি পাও, তবে দয়া করিয়া একবার আমাদের বাড়ী গিয়া, আমার পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা করিয়া আইস। আরও তাঁকে বলিও, আমার জন্য তিনি যেন কোন চিন্তা না করেন। চিত্ত স্থির হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তোমার নিকট আমার যে ১০০৲ টাকা জমা আছে, আমার মাকে দিও। ইতি তারিখ ২রা বৈশাখ, ১১৭০ সাল।

তোমার

যাদবেন্দ্র।

হাল সাকিন্ বেলপাড়া।"

মহামায়া এই সাংঘাতিক লিপিমর্ম্ম শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "যাদব রে, বাপ্ যাদব রে!" বলিয়া অবিশ্রান্ত বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার আকস্মিক রোদন-শব্দে বাড়ীর অপর সকলে ছুটিয়া আসিল। নিকটস্থ প্রতিবেশীরাও মহামায়ার বাড়ীতে প্রবেশ করিল। লুটবিহারীর প্রমুখাৎ সকল বিবরণ শুনিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইল।

পুত্রহারা শোকাতুরা মহামায়াকে বিবিধবচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

কিয়ংকাল শোকবিষাদে কাটিয়া গেল।

অনন্তর যাদবেন্দ্রবন্ধু লুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহামায়ার নিকট ১০০্'টাকা রাখিয়া সদুঃখে বলিল, "আপনি আর শোকাকুল হবেন না। পত্রের মর্ম্মে তো জানা যাচ্চে, যাদবেন্দ্র একটু স্থির হলেই আপনার নিকট আসবে। আমিও বিশেষরূপে সন্ধান করি গিয়ে। অল্পদিনের মধ্যে আবার আপনার নিকট আসবো।" এই বলিয়া যাদবসখা গাত্রোত্থান করিল।

তখন শোকাকুলা অশ্রুভারকাতরা মহামায়া সরোদনে লুটবিহারীকে বলিল, "বাবা! তুমিও আমার ছেলে। যাদব আর তুমি ভিন্ন নও। এই অভাগিনী বিধবা যাতে শীগ্‌গির যাদবকে পায়, তার জন্য বিশেষ কোরে চেষ্টা কোরো।"

লুটবিহারী বলিল, "তা আর বোল্‌তে হবে না, মা! আপনিও যেমন পুত্রশোকে কাতরা, আমিও তেমনি বন্ধুবিরহে অধীর। বেশী আর কি বল্‌বো, যদি ঈশ্বর সত্য হন, তবে নিষ্ঠুর ধনেশ্বর সিংহ রায়

অবিলম্বেই আপনার যাদবের আর আমার এই নিদারুণ মর্ম্মব্যথা প্রদানের উপযুক্ত ফলভোগ করবে।" এই বলিয়া লুটবিহারী বন্ধুবিরহে ব্যথিত-হৃদয় ও সজলনয়ন হইয়া প্রস্থান করিল।

পর দিন প্রাতে মহামায়া কপিলপুর গ্রামে জ্যেষ্ঠা কন্যার ভবনে যাত্রা করিল। যদি সেখানে গিয়া যাদবকে দেখিতে পায়। তাও যদি না হয়, তবে জামাতাকে দিয়া পুত্রের সন্ধান লওয়াও হইবে। এই মহামায়ার আন্তরিক ইচ্ছা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কন্যাভবনে।

যথাসময়ে সুতশোকসন্তপ্তহৃদয়া মহামায়া কপিলপুরে কন্যাগৃহে পঁহুছিল। কন্যা, জামাতা প্রভৃতি তাহার মুখে এই কুসংবাদ শ্রবণ করিল। স্নেহময়ী সহোদরের শোকে অত্যন্ত কাতর হইল, কাঁদিতে লাগিল। মহামায়ার জামাতাও কাতর হইল, কিন্তু তত নহে। না হইবারই কথা। তা যাই হউক, তথাপি শ্বশ্রুঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা করিল এবং যাদবেন্দ্রের অনুসন্ধান জন্য সচেষ্ট হইল।

এ দিকে দ্রবময়ী দিনের কার্য্য সারিয়া মহামায়ার কন্যা স্নেহময়ীর বাটীতে আসিল। কি মহামায়ার থাকিবার সময়, কি না থাকিবার সময়, সকল সময়েই দ্রবময়ী স্নেহময়ীর বাটীতে আসিত। রাত্রে তাহার স্বামী ভীমভাম আসিলে, বাড়ী যাইত। আজ দ্রবময়ী আসিয়া দেখিল, তাদের পরমহিতৈষিণী মহামায়া আসিয়াছে। কিন্তু অনেক দিনের পর আজ তাহাকে দেখিয়া কোথা আনন্দ

লাভ করিবে, না নিরানন্দ-সাগরে ডুবিয়া গেল!

মহামায়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত বলিল। দ্রব-ময়ী আকুলান্তঃকরণে শুনিল। হৃদয়ে গুরুতর ব্যথা বাজিল। চক্ষু ফুটিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল। একে দ্রবময়ী কোমলহৃদয়া রমণী, তাহাতে হিতৈষিণীর পুত্রশোক, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, দ্রবময়ীর হৃদয়যন্ত্রণা প্রকৃত কি কৃত্রিম।

পরস্পরের বিলাপ সন্তাপে, দীর্ঘনিশ্বাসে সন্ধ্যা আসিল। সন্ধ্যার পর রজনী আসিল। এমন সময়ে ভীমভাম স্নেহময়ীর বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া, দ্রবময়ীকে তাহার আগমন-সংবাদ পাঠা-ইল। মহামায়া ভীমভামকে নিকটে ডাকাইল; স্নেহময়ী অন্তরালে গেল। ভীমভাম বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মহামায়ার নিকটে উপস্থিত হইল। মহামায়ার মুখে তৎপুত্রের সমস্ত ঘটনা শুনিল। দুঃখ প্রকাশ করিল। কিন্তু ভীমভামের এ দুঃখ গড়া দুঃখ। তা তো হবেই। ভীমভাম যে, যাদ-বেন্দ্রের সমস্ত ব্যাপার জানে। জানা বলিয়া জানা, গুরুশিষ্য সম্বন্ধ। তা যাউক, ভীমভাম মহামায়াকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, "অত উতলা হয়ো না।

তোমার যাদবকে শীঘ্রই পাবে। আমিও তার সন্ধান নিচ্চি। তুমি এই বৈশাখ মাসটা কপিলপুরেই কাটাও।” এই বলিয়া একবার ভাবিল, “প্রকাশ করি।” আবার ভাবিল, “না। কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্বে যে কথা প্রকাশ করে, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জয়পরাজয়।

অদ্য ২০এ বৈশাখ। ধনেশ্বর সিংহ রায় জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত। প্রায় অধিকাংশ জমীদারদের মধ্যে এইরূপ শুভকার্য্যের সময়, প্রজাদের উপর একটা ভয়ানক অশুভ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। সেটা এক রকম সখের ডাকাতি। জমীদার দিবেন নিজপুত্রকন্যার অন্নপ্রাশন বা বিবাহ, গরীব প্রজারা দিবে তাহার খরচ। অথচ জমীদার যথেষ্ট অর্থব্যয় ও জাঁকজমক করিয়া শুভ কার্য্য সারিলেন, এ কথাটা রাষ্ট্র হওয়া চাই। জমীদার ধনেশ্বরও এই উপায় অবলম্বন করিল। নিজ জমীদারীর প্রজাদের নিকট বেশী হারে মাথট—বরং ডাকাতি বলিলে আরও সঙ্গত হয়—আদায় করিতে লাগিল। প্রত্যেক প্রজার নির্দ্দিষ্ট খাজনার প্রতি টাকায় বড় জোর দুই আনা হিসাবে মাথট ধরিলে বরং কাহারো কষ্ট হইত না। কিন্তু টাকায় টাকা মাথট ধরা হইল। দরিদ্র প্রজার জিব বাহির হইয়া

পড়িল। কোথায় তাহারা জমীদারের কন্যার শুভ-বিবাহে যথেষ্ট আনন্দভোগ করিবে, না নির্জ্জনে চক্ষের জল মুছিয়া ভগবান্‌কে মনের দুঃখ জানাইতে লাগিল।

বলা বাহুল্য যে, এতাদৃশ উচুঁহারে মাথট বা চাঁদা আদায় করিয়া ধনেশ্বরের অনেক টাকা জমা হইল। প্রজাদের এক বৎসরের খাজনার টাকা খার্মখা ফাঁকতালে ধনেশ্বরের লৌহসিন্ধুক পূর্ণ করিল। সহজ কথা কি? আজ দুই মাস ধরিয়া প্রজাদের এই রক্তশোষণ আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় আর একটা দরকারী কথা বলিয়া রাখি। এক বড় মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া ধনেশ্বর অন্যদিকে ধনবৃদ্ধিটা করিয়া লইল। ধনেশ্বর যেরূপ পিশাচ, যেরূপ অর্থলোভী, তাহাতে সে যে এই রাশীকৃত আদায়ী টাকার মধ্যে ষোল আনার বড় জোর দুই আনা অংশ ব্যয় (তার পক্ষে অপব্যয় বলিলে ভাল হয় না।) করিবে কি? পুঁজি বাড়িল। ও মা সরলা! তোর দৌলতে তোর বাবার আজ পোয়া বারো।

ধনেশ্বর ব্যয়সংক্ষেপ পক্ষে আর একটা কুটিল কৌশল খাটাইল। গত ২রা বৈশাখে মধুসুদনপুরের

দোকানে তাহার অনেক টাকা ডাকাতে লুঠিয়াছে, সুতরাং "বড় দুঃসময়" বলিয়া আশানুরূপ খরচপত্র করিতে পারিল না। ধনেশ্বরের শাপে বর হইল!

এক্ষণে ধনেশ্বর কোথায়? অন্দর মহলে ভামিনীর নিকট। পতিপত্নীতে মিলিয়া সরলার বিবাহের কথা হইতেছিল। সকল কথায় আমার বা পাঠকপাঠিকার প্রয়োজন নাই। গোটা কএক কথার উল্লেখ করা যাউক।

ভামিনী বলিল, "একটা কথা বল্‌বো কি?

ধ। কি?

ভা। যাদবেন্দ্র তো হতাশ হোলো। তাকে হাজার দুই টাকা দিলে ভাল হয় না?

ধ। সে এখানে নাই। আমার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে চোলে গিয়েছে।

ভা। কেন চাকরি ছাড়্‌লে?

ধ। (মনের ভাব গোপন করিয়া) তা জানি নি।

ভা। আমার বোধ হয়, সরলার সঙ্গে তার বিয়ে হোলো না বোলেই মনের দুঃখে এ কাজ কোরেচে।

ধ। (বিরক্ত হইয়া) তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেচে নাকি?

ভামিনী লজ্জিত হইল। বলিল, "আমার বলার উদ্দেশ্য এই, সে সরলার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো, তাকে কিছু টাকা দেওয়া তো ন্যায়ের কাজ।"

ধ। অন্যায়ই বা কি কোরেচি? খোরাক পোশাক ছাড়া মাসিক আট টাকা বেতনের নকল-নবিশী কাজ দিয়েছিলেম্।

ভা। তবু—

ধ। (বাধা দিয়া বিরক্তভাবে) আঃ, ও সকল কথা ছাড়। আর যদি কিছু বল্‌বার থাকে, বল।

ভা। (কিঞ্চিৎ হাস্যমুখে) আমি কিছু প্রার্থনা করি।

ধ। কন্যার বিবাহে প্রসূতির প্রার্থনা!

ভা। আর তো কখন কোন সুযোগ পাইনি। বাড়ীতে দোল দুর্গোচ্ছব, পালপার্ব্বণ কিছুই তো কর না। কোন্ সময় তোমার কাছে কি চাই? কাজে কাজে আজ সরলার বিয়ের দৌলতে কিছু চাইতে পারি নি কি?

ধ। কি চাও?

ভা। এক লাখ্ টাকার জড়োয়া গহনা।

ধ। (সবিস্ময়ে) বল কি!

ভা। (সাবদারে) হ্যাঁ।

ধ। তোমার কি গহনা নেই?

ভা। আছে। তবু—

ধ। (বাধা দিয়া) ওগো না না। স্ত্রীলোকের অত টাকার গহনায় লোভ হ'লে পতিভক্তি কোমে যায়।

ভা। ও মা! সে কি কথা গো! কে বোল্লে?

ধ। শাস্ত্রকারেরা।

ভা। (সপরিহাসে) সে সকল শাস্তরকারদের বুঝি মাগ নেই!

ধ। আর কি বোল্‌বে বল?

ভা। আচ্ছা, সরলাকে কি কি গহনা দিচ্চ?

ধ। তা আমি দেবো কেন? বরের বাপ সমস্ত অলঙ্কার দেবে।

ভা। কত টাকার গহনা?

ধ। নগদ টাকাটা তো আর নিতে পারবো না। সুতরাং সেই টাকাটাও গহনায় মিশিয়ে দু' লক্ষ টাকার জহরতের অলঙ্কার।

ভা। তা বেশ হোয়েচে। এখন আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ছোট মেয়ে তরলাকে কি দেবে?

ধ। (সপরিহাসে) কে? সরলার শ্বশুর?

ভা। বেশ, যা হোক্। সরলার শ্বশুরের সঙ্গে তরলার কি সম্বন্ধ? তোমার ছোট মেয়েকে তুমি কি গহনা দেবে?

ধ। তার বিয়ে যখন হবে, তখন দেবো।

ভা। সে কি কথা গো! বড় মেয়ের বিয়েয় ছোট মেয়ে ভিখিরীর মেয়ের মত ঘুরে বেড়াবে?

ধ। তার কি গহনা নাই?

ভা। থাক্‌লেই বা। সরলা পর্‌বে নতুন গয়না, তরলা পর্‌বে পুরুণো গয়না? আমাকে না হয় না দিলে। ছোট মেয়ে সাজসজ্জারই পুতুল। তাকে একখানিও গয়না দেবে না? বল, কি কি দেবে?

ধ। এর পর দেবো গো।

ভা। না, তা হবে না। মায়ের চক্ষে দুই মেয়েই সমান। কি কি গয়না দেবে বল।

ধ। এখন হাতে তেমন টাকা কড়ি নেই। জান তো, সে দিন ডাকাতিতে কত টাকা লুট হোয়ে গেচে।

এইবার ভামিনী সাক্ষাৎ ভামিনী হইল।

রোষভরে বলিল, "তুমিও কোন্ কম ডাকাতি কোল্লে! প্রজারা তার সাক্ষী।

ধনেশ্বর একটু ব্যতিব্যস্ত হইল। বলিল, "এই সকল কাজে জমীদারেরা এইরূপ কোরে থাকে।"

ভামিনী বলিল, "এই সকল কাজে জমীদারের পত্নীও জমীদার পতির কাছে মাথট নেয়। শোনো, আমি মনের কথা খুলে বল্‌চি—তরলাকে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকার জড়োয়া দিতে হবে। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে বড় মেয়ের দু'লাখ টাকার গহনা নিলে, ছোট মেয়েটার বেলায় নিজে থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকাও বুঝি দিতে দম্ ফাটে! মেয়ে বড়, না টাকা বড়!"

ধনেশ্বর ইতস্তত করিয়া উত্তর করিল, "তুমি দেখ্‌চি বড় বাড়াবাড়ি কোল্লে।

রুষ্টা ভামিনী আরও রুষ্ট হইল। বলিল, "আচ্ছা, দেখি তুমি আমার কথা শোনো কি না! আমি আজই যাদবেন্দ্রের সঙ্গে সরলার বিয়ের যোগাড় কচ্চি। তোমার কলকৌশল, জারিজুরি সব ভাঙ্‌চি।"

এইবার ধনেশ্বর ফাঁফরে পড়িল। "তোমার কলকৌশল, জারিজুরি সব ভাঙ্‌চি" কথাটা বড় শক্ত, বড় গভীর, বড় জটিল। পাঠকপাঠিকারা এই কথার রহস্যটা জান্‌বার জন্য, বোধ হয়, বড় উৎসুক হইলেন। কিন্তু সেটা এখন বলিতে পারিলাম না। তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ভামিনীর উৎকট বাক্‌তাড়নায়, উন্মত্তবায়ু-তাড়িত বৃক্ষের ন্যায় ধনেশ্বর অত্যন্ত অস্থির হইল। কথা কাটিবার আর কোন উপায় না দেখিয়া, বাধ্য হইয়া বলিল, "আচ্ছা! তরলাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার গহনা দেবো।"

ভামিনী বলিল "তুমি এখনি পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ এনে আমার হাতে দাও। আমি জহরী-দের ডাকিয়ে পছন্দসই গহনা কিনে দিচ্চি। তোমার উপর আমি নির্ভর কোরে থাক্‌তে পারিনি। তোমার পলকে পলকে কথা পাল্টায়।"

চামুণ্ডার হস্তে রক্তবীজ "পপাত ধরণীতলে"। আর উপায় নাই—পথ নাই—আলোক নাই—রক্ষা নাই। ধনেশ্বর গুড় গুড় করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার পঁচিশটি তোড়া আনাইয়া উগ্রচণ্ডার নিকট

বলিদান দিল। হইল ভামিনীর জয়! ধনেশ্বরের পরাজয়!

ধনেশ্বর উঠিয়া যাইবার সময় বড় মনের দুঃখেই চলিয়া গেল, "পঞ্চাশ হাজার টাকাই মাটি। পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরাৎ বেচ্‌তে গেলে বড় জোর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। নগদ টাকার গুণ মেয়েমানুষে বুঝ্‌লে কি সুখই হোতো।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিয়েবাড়ী।

"দিন যায় রাতি আসে, রাতি যায় দিন আসে" এই শব্দ করিয়া কালচক্র পাকে পাকে ঘূরিতে লাগিল। কএক পাক ঘূরিবার পর দেখা গেল, বৈশাখ মাসের ২০এ, ২১এ, ২২এ, ২৩এ, ২৪এ, ২৫এ, ২৬এ, ২৭এ তারিখ বা দাগগুলি পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে এবং ২৮এ তারিখ বা দাগটির পাক দেখা দিয়াছে, অর্থাৎ অদ্য ২৮এ বৈশাখ—সরলার বিবাহের দিন।

নহবৎখানায় নহবৎ ও রৌশনচৌকীর বাদ্য হইতেছে। প্রাঙ্গণে ঢোল, কাঁসী, জগঝম্ফ, কাড়া, যোড়ঘাই, সানাই লইয়া বাদ্যকারেরা বিবাহের নানাবিধ বাদ্য বাজাইতেছে। ধনেশ্বরের দাস দাসী দ্বারবানেরা গোলাপী রঙের কাপড়, চাদর, শাড়ী ও রূপার বালা পরিয়াছে। কিন্তু সেগুলা কম দামের অথচ ভড়ংটা বেশ। এ সকল ধনেশ্বরের হাতটানের কায়দা কৌশল। বড় বড় আমলা-

দের মধ্যে কেহ কেহ শাল রুমালও বক্‌সিস্ পাই-য়াছে। কিন্তু সে গুলার মূল্য কসিয়া দেখিলে আমলাদের পক্ষে শাল "শাল" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবু যাই হউক, "নাই মামার চেয়ে কাণা মামাও ভাল।" খাওয়ানো দাওয়ানোর বিষয়টাও তথৈ-বচ। সাবাস্ ধনেশ্বর! বলিহারি যাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাবু! তোমার সকল কাজেই কি দু রকম চালটা চালা অভ্যাস? গ্রাম-বাসী কন্যাযাত্রীদের বেলায় গুড়ে মণ্ডা আর বর-যাত্রীদের বেলায় আধা ছানার কাঁচা গোল্লা। তুমি গোল্লায় যাও।

গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি বিয়েবাড়ী আর ছাড়িতে চায় না। ঢোলের আওয়াজে তাদের ঘুমন্ত আমোদ জাগিয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ঢোল কাঁসী সানাইয়ের আওয়াজ থামে, তবু তাদের আমোদ আর থামিবার নয়। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের অনন্ত উষ্ণজলোচ্ছ্বাসের ন্যায় তাহা-দের হৃৎকুণ্ডের জীবন্ত আমোদোচ্ছ্বাস অনন্ত হইয়া বাহির হইতেছে। বাস্তবিক, শৈশব দশার আমোদের অপেক্ষা জীবন্ত আমোদ আর নাই।

সংসারে প্রবেশ করিবার পর যে আমোদ, সে তো মরন্ত! শৈশবের আমোদে হাসির গোলাপ ফুল ফোটে, শৈশবের পরের আমোদে গোলাপ ডাঁটার কাঁটা ফোটে—কান্না ওঠে। হা কপাল! আমার সে সুখের দিন গিয়াছে। এখন গোলাপ ফুল আর ফোটে না, ফোটে কেবল তীক্ষ্ণধার কাঁটা!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যুগল সন্ন্যাসী।

বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। বৈশাখের প্রখর সূর্য্যের তেজ কমিয়াছে। সূর্য্যঠাকুরের প্রত্যহই শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য ঘটে। প্রভাতে শৈশব, প্রথম প্রহরে কৈশোর, মধ্যাহ্নে যৌবন এবং অপরাহ্নে বার্দ্ধক্য। মানুষেরও তাই। মানুষ জীবনের সকালবেলায় বালক, তুপুরবেলায় যুবা, বিকালবেলায় বৃদ্ধ। সূর্য্যের ন্যায় মানুষও তুপুরবেলায় অর্থাৎ যৌবনে বড় তেজ প্রকাশ করে। কিন্তু মহতের তেজ সহ্য করা যায়, ক্ষুদ্রের তেজ বড় অসহ্য; এই জন্য সূর্য্যের মধ্যাহ্ন-তেজ বরং প্রাণে সয়, মানুষের মধ্যাহ্ন-তেজ সয় না। একটা সুন্দর কথা প্রচলিত আছে,—"বরঞ্চ সূর্য্যের প্রখর তাপ মাথায় সহিতে পারি, কিন্তু তাঁর তাপে উত্তপ্ত সামান্য বালুকাকণার তাপ পায়ের তলাতেও সহিতে পারি না।" কথাটির প্রত্যেক অক্ষরই জ্বলন্ত, জীবন্ত।

সামুটী গ্রামের এক পোয়া পথ দূরে মাঠের

মধ্যে একটি দীর্ঘিকা ছিল। উহার উত্তর দক্ষিণে দুইটি ঘাট। প্রত্যেক ঘাটের চাতালের দুই পার্শ্বে বকুল বৃক্ষ। বৈশাখী বৈকালে মলয়-সমীর-হিল্লোলে বকুল-ফুল-ফুলের মনোহর সৌরভ শূন্য-কোলে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। ফুলে বসিবে কি সৌরভে মিশিবে, এই ভাবিয়া মৌমাছীরা, যেন দিশাহারা হইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল। মহাভারতে দেখিতে পাই, মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ-সুয় যজ্ঞের সময় মহাবীর দাতা কর্ণকে ধন বিত-রণের ভার দিয়াছিলেন। বকুলবৃক্ষগুলিও মলয়-সমীরণকে দানকার্য্যের ভার দিয়াছিল। মলয়-সমীর মনের সাধ মিটাইয়া, বকুল বৃক্ষের অনন্ত পুষ্পরত্ন, তলস্থিত ভূতল, জল, চাতাল, তৃণদলকে বিলাইতেছিল। বিতরণকার্য্যে শ্রম নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল পুষ্পরত্নবর্ষণ। সেকালের রাজারা, ধনীরা দরিদ্রদিগকে এইরূপ রাশি রাশি ধনদান করিতেন, এ কালের বৃক্ষেরা সেই স্বর্গীয় গুণ পাইয়াছে। কিন্তু এখনকার রাজা, ধনীরা বিপ-রীত হইয়াছে—এইরূপ সাত্ত্বিক দানধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছে।

দীর্ঘিকার চারি দিকেই নানাবিধ ফুলফলের গাছ চলন্ত বাতাসের সহিত খেলা করিতেছিল,— ডাল পাতা দুলাইতেছিল। বাতাস আশ মিটাইয়া বাঁশী বাজাইতেছিল। বড় বড় ঝাউগাছগুলি বাতাসের বাঁশীবাজানো শিখিতেছিল; তাই সাঁই সাঁই শব্দ হইতেছিল। যার কান আছে, কানে আবার সুরবোধ আছে, সেই ব্যক্তিই সেই "সাঁই সাঁই" রাগরাগিণীর মর্ম্ম বুঝিতে পারে। তোমার আমার ক্লারিয়নেট্, ফ্লুট্, ইত্যাদি বিলাতী শুষির যন্ত্রের আওয়াজে তার আর কান বসে না, প্রাণ রসে না।

আকাশের পশ্চিম দিকে সূর্য্য যত গড়াইতেছিল, বৃক্ষরাজির ছায়াকে পূর্ব্বদিকে তত বাড়াইতেছিল। দীর্ঘিকার পশ্চিমতীরস্থ তরুদলের নিবিড় ছায়া জলের উপর গা-ভাসান দিয়া দুলিতেছিল। বৃক্ষবংশ দোলা বড় ভালবাসে। এত ভালবাসে যে, কায়া দোলাইয়া সাধ মিটে না, তাই জলে ছায়াও দোলায়। বাস্তবিক, বড় মনোহর ছবি! স্থলে দোলে কায়া, জলে দোলে ছায়া!

দীর্ঘিকার স্বচ্ছ সলিলের কোন অংশে কমল,

কোন অংশে কুমুদ, কোন অংশে কহ্লার, আবার কোন অংশে কমল, কুমুদ, কহ্লার একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ভাসিতেছিল। কমলদল ফুটিয়া হাসিতেছিল, কুমুদদল মুদিয়া কাঁদিতেছিল। দীর্ঘিকাটি যেন একটি ক্ষুদ্র সংসার, হাসিকান্নার হাট। ভ্রমরেরা উড়িয়া আসিয়া, গুঞ্জন ভাষিয়া, কমলের মধু লুটিতেছিল, কিন্তু ভুলিয়াও কুমুদের কাছে যাইতেছিল না। তা তো না যাইবারই কথা। এত বড় লম্বা চৌড়া মানুষ যখন এত সূক্ষ্মবুদ্ধির ভাণ্ডার হইয়াও, "যেখানে রস, সেখানে বশ", তখন অতটুকু ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভ্রমর যে কমলের গোলাম হইবে এবং কুমুদের মলিন মুখখানির পানে ফিরিয়াও তাকাইবে না, তার আশ্চর্য্য কি।

দীর্ঘিকার জলরাজ্যের আর একটা জীবের কথা মনে পড়াতে, একটা সংস্কৃত শ্লোকও আমার মনে জাগিল,—

> "অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
> গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্‌ফরায়তে॥"

অগাধজলে সঞ্চরণকারী রোহিত মৎস্য বিকৃত হয় না, কিন্তু অল্পজলে পুঁঠীমাছও লাফালাফি

করে। কথাটা সত্য। এই জলরাজ্যের রুই ও পুঁঠীর ন্যায় স্থলরাজ্যেও অনেক মানুষ-রুই ও মানুষ-পুঁঠী দেখিতে পাই। দীঘির জলে বড় বড় রুই, কাৎলারা নীচের দিকেই গম্ভীর ভাবে সঞ্চরণ করিতেছিল, আর ছোট ছোট চুনো পুঁঠী কিনারার অল্পজলে ঝাঁকঝক্কাব দিয়া লঘুতা প্রকাশ করিতেছিল। মানুষের মধ্যেও এইরূপ ঠিক না?

সেই দীর্ঘিকার দক্ষিণদিকের ঘাটের চাতালে একটি লোক বসিয়াছিল। আকার প্রকারে লোকটি রাজা উজীর নয়, সৌখিন বাবু নয়, একটি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর যে সব চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও তাই ছিল। পরিধানে কৃত্তিবাস, সর্ব্ব-অঙ্গে ভস্মরাশ; তন্মধ্যে বদনমণ্ডলেই ভস্মের ভাগটা বেশী। ভাল জিজ্ঞাসা করি, সচরাচর সন্ন্যাসীরা মুখেই কেন বেশী ছাই মাখে? আমার বোধ হয়, ইন্দ্রিয়বিকারের প্রথম ও প্রধান পথ মানুষের মুখ। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ও নাসিকাই যত সর্ব্বনাশের মূল। এই কয়টা পদার্থই মানুষকে কুপথে টানিবার প্রধান শত্রু। এমন দুরন্ত শত্রুকে ষোল আনা শাস্তি দেওয়া উচিত; তাই

সন্ন্যাসীরা অন্যান্য অঙ্গাপেক্ষা মুখখানাতেই বেশী করিয়া ছাই চাপায়। আমাদেরো সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য যে, সন্ন্যাসীদের অন্য সকল গুণ যদিও আদায় করিতে না পারি, কিন্তু মুখে ছাইমাখাটা যেন ভাল করিয়া আদায় করি। "মানুষের মুখে ছাই" কথাটা নির্ব্বোধের পক্ষে গালাগালি, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে প্রশংসা।

চত্বরোপবিষ্ট সন্ন্যাসী—যুবা। হস্তে একটি রক্ত-চন্দনমণ্ডিত ক্ষুদ্র লৌহত্রিশূল। মস্তকে পৃষ্ঠ-লম্বিত জটাভার। সন্ন্যাসী একমনে ত্রিশূল ধরিয়া বসিয়াছিল। তাহার দৃষ্টিরেখা সলিলশোভিত একটি আধফোটা পদ্মফুলের উপর পতিত ছিল। সন্ন্যাসী মুখে কোন কথা কহিতেছিল না বটে, কিন্তু তাহার অচল চক্ষু যেন সেই অর্দ্ধবিকসিত পদ্মটির সঙ্গে কি কথা কহিতেছিল।

এমন সময়ে অপর এক জন দীর্ঘত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী আসিয়া, উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে বলিল, "উঠো, বেটা, চলো।"

উপবিষ্ট সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী অগ্রে অগ্রে

চলিল। ক্ষুদ্রত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

কিয়ৎ দূর গিয়া, ক্ষুদ্রত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী বিনয়-নম্রবচনে দীর্ঘত্রিশূলধারী সন্ন্যাসীকে বলিল, "গুরুজী! সামৃটী গাঁওকে তরফ্ কেঁও আপ্ যাতে হো?"

"তুমারা আজ্ উহাঁ পরীচ্ছা হোগা।"

"ক্যায়সা পরীচ্ছা, গুরুজী?"

"চিত্ত তেরা স্থির হুআ কি নেহি, ওহি আজ্ ম্যায় দেখুঙ্গা।"

"আচ্ছা, গুরুজী! সামৃটী গাঁওমে কোন্ চিজ্‌সে মেরা চিত্তপরীচ্ছা হোগা?"

"আজ উহাঁ ধনেশ্বরকা বড়ী লড়কী কি সাদি হোগী। তুম্ ওহি ঘটনা দেখ্ কর চঞ্চল হোও ক্যা অচঞ্চল রহো, ম্যায় নে উসিকা পরীচ্ছা করুঙ্গা। আজ কো ঘটনা সে অগর ম্যায় দেখে যো তুম্ নির্ব্বিকার হুআ হ্যায়, তো তুম্‌কো যোগাভ্যাস শিখ্‌লাউঙ্গা; নেহি তো তুম্‌কো শিষ্যত্বসে খারিজ করুঙ্গা।"

"আচ্ছা, গুরুজী! মুঝ্‌কো পরীচ্ছা কিজিয়ে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কালীবাড়ী।

সামৃটী গ্রামে একটি কালীবাড়ী ছিল। ধনেশ্বর সিংহ-রায়ের পিতা ৺শিবনাথ সিংহ রায় সেই কালীবাড়ী স্থাপন করিয়াছিলেন। কালীবাড়ীটি দেখিতে অতি সুন্দর। দক্ষিণদ্বারী উচ্চমন্দির মধ্যে পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটির নাম শ্রীশ্রী৺আনন্দময়ী। মন্দিরের সম্মুখে সুবিস্তৃত নাটমন্দির। দেবীমন্দির ও নাটমন্দিরের চতুর্দ্দিকে দূরবিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত ভূমি। লোকজনের যাতায়াতের জন্য সেই তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ডের ইতস্ততঃ সুরকিঢালা পথ। মন্দিরের পশ্চিম দিকে দ্বাদশটি শিবমন্দির। বাম দিকে ফুলের বাগান ও একটি পুষ্করিণী। এই সমস্তের পর চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের চারি দিকেই চারিটি প্রবেশদ্বার, তন্মধ্যে দক্ষিণ দিকের দ্বারটি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও বৃহৎ। সেই দ্বারের বহির্ভাগে

দাঁড়াইয়া মন্দির মধ্যে আনন্দময়ীর দর্শন পাওয়া যাইত। প্রবেশদ্বারে একটি, নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে একটি এবং আনন্দময়ীর খাসমন্দিরে একটি, এইরূপ তিনটি পিত্তলনির্ম্মিত বৃহৎ ঘণ্টা, লৌহশৃঙ্খলযোগে কড়িকাঠ হইতে ঝুলিতেছিল। নাট মন্দিরের একটি কোণে একটি বৃহদাকার নাগারা যন্ত্র ছিল। আরতির সময় শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝ, ঘড়ী, কাঁসরের সহিত সেই নাগারাও বাজিত। কালীবাড়ীর স্থানটি অতি মনোহর ও অতি পবিত্র। না হইবে কেন? যেখানে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তস্থানসৃজনকারিণী জগজ্জননী স্বয়ং বিরাজমানা, সে স্থান তো ভক্তের চক্ষে, স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়স। প্রাচীরসংলগ্ন দক্ষিণ দিকের প্রধান দ্বারের বহির্ভাগে দুই তিন বিঘা পতিত জমী ছিল। তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসীরা দলে দলে সেখানে আসিয়া দুই এক দিন বিশ্রাম করিত। দীননাথ সিংহ রায়ের খরচে সকলে উত্তম উত্তম সিধা, কম্বল, বস্ত্র ইত্যাদি প্রাপ্ত হইত। কিন্তু সেই সদাশয় মহাত্মার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র ধনেশ্বর সিংহ রায় পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, স্বর্গীয় পিতার কীর্ত্তিলোপ করিয়াছিল।

সন্ন্যাসীরা আর আসিত না। বালাই লইয়া মরি! এমন গুণধর পুত্র আর নাই!

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে উক্ত দুই জন সন্ন্যাসী সেই কালীবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়ে প্রথমে নাটমন্দিরে গিয়া, আনন্দময়ীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তার পর তথা হইতে বাহিরে আসিয়া, তৃণাচ্ছাদিত সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে বিশ্রামস্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। ঐ ভূমির স্থানে স্থানে কোথাও বট, কোথাও অশ্বত্থ, কোথাও একত্র বটাশ্বত্থ, কোথাও বা আম্রবৃক্ষ ছিল। উহারা উভয়ে একটি অশ্বত্থবৃক্ষমূলে গিয়া উপবেশন করিল। উপবিষ্ট হইয়া, উভয়ে নিমীলিতনেত্রে ধ্যান করিতে লাগিল।

গ্রামের কোন কোন ভক্তিমান্ পুরুষ ও ভক্তিমতী স্ত্রীলোক আসিয়া ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীযুগলকে প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ কেহ এক একটা পয়সা, কেহ কেহ এক আধ কুণিকা চাউল প্রণামী দিল। কেহ কেহ বা তাঁহাদিগের মুখে শাস্ত্রকথা শুনিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল

না। তখন তাহারা ভাবিল, এই দুই জন সন্ন্যাসী মৌনব্রতী। সুতরাং আর কিছু বলিল না।

অনন্তর সূর্য্যদেব হীরকমুকুট খুলিয়া, মাণিকের মুকুট পরিলেন। পৃথিবীর লোককে অল্পক্ষণের জন্য লোহিতমণিমুকুটের বিভা দেখাইয়া, পশ্চিম দিকের কোন এক অজ্ঞাত প্রদেশে অন্তর্হিত হইলেন। সূর্য্যদেব নরচক্ষুর অন্তরালে গেলেন বটে, কিন্তু তখনও যে অনেক দূর যাইতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল পশ্চিমাকাশে উদীয়মান মেঘখণ্ডমণ্ডলে। কেন না মেঘখণ্ডমণ্ডলীর বক্ষোমুখমুণ্ডে সূর্য্যের মাণিকমুকুটের রক্তাভা প্রতিবিম্বিত হইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। সন্ধ্যা যদিও শ্যামাঙ্গী, কিন্তু তার অতি সুন্দর মুখশ্রীর তুলনা মিলে না। আহা, কি মধুর মুখখানি! স্ত্রীলোকের স্বভাবসুলভ লজ্জায় মিশিয়া আছে। দিবা যদিও অতীব সুন্দরী, কিন্তু তার মুখশ্রীতে আদৌ লজ্জা নাই। দিবা বড় বেহায়া—বড় প্রগল্‌ভা। সুতরাং শ্যামাঙ্গী সন্ধ্যার কাছে গৌরাঙ্গী দিবা রূপে বড়, কিন্তু গুণে ছোট।

অদ্য আঠাশে বৈশাখ শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী

তিথি। ত্রয়োদশকলাবিশিষ্ট মনোহর চন্দ্র আকাশে দেখা দিলেন। সায়ংশ্চন্দ্রের বিধৌত কিরণ আসিয়া অশ্বত্থতলোপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী যুগলের অঙ্গে পতিত হইল। উভয় সন্ন্যাসীর দেহলিপ্ত ভস্মলেপ ধপ্ ধপ্ করিতে লাগিল। সে শোভার তুলনা নাই।

সন্ধ্যার সময় আনন্দময়ীর আরতি আরম্ভ হইল। পুরোহিত ঠাকুর পঞ্চপ্রদীপাদি নাড়িয়া, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া, নানাবিধ হস্তকৌশলে জগদীশ্বরীর আরতি করিতে লাগিলেন। এক জন ভৃত্য নাট-মন্দিরস্থ বৃহৎ নাগারার চর্ম্মাবরণে তালে তালে দণ্ডাঘাত করিতে লাগিল। নাগারার গম্ভীর ধ্বনি সাম্টী গ্রামের আদ্যোপান্ত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অন্যান্য ভৃত্যেরা হাতঘড়ী, ঝাঁঝ, কাঁসর প্রভৃতি মাঙ্গলিক ঘনযন্ত্র বাজাইতে লাগিল। প্রায় পনর মিনিট পর্য্যন্ত আরতির ঘটা রহিল; তার পর থামিল। অমনি মন্দিরস্থ সমস্ত লোক “জয় মা আনন্দময়ি!” বলিয়া, ভূললাট হইয়া প্রণাম করিল। মন্দিরের বহির্ভাগে যে দুই জন সন্ন্যাসী ধ্যানোপবিষ্ট ছিল, তাহারাও স্বস্থানে বসিয়া ভগবতীকে প্রণাম করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ দূরে একটি কণ্ঠে "জয় মা" ও অপর কণ্ঠে "কালী" এই শব্দ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া দীর্ঘত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিয়া, "বোম ভোলানাথ" বলিয়া শব্দ করিল। যে দিকে "জয় মা কালী" শব্দ হইয়াছিল, সে দিকে সাবৃটী গ্রামের দুই জন অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়াছিল। তাহারাই "জয় মা কালী" শব্দ করিয়াছিল। এখন তাহারা "বোম্ ভোলানাথ" প্রতিশব্দ শুনিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ক্ষুদ্রত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী এই শব্দকাণ্ডের কিছুই বুঝিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রজাপতি যাগ।

এ দিকে সন্ধ্যার পর সরলার বর আসিয়া উপস্থিত হইল। বরের নাম নীলকান্ত রায় এবং তাহার পিতার নাম বংশীধর রায়। নিবাস মাধবনগর। বংশীধর রায়ও একজন ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার। ধনেশ্বরের ন্যায় ধনে, কিন্তু মনে নহে। বংশীধর রায় সর্ব্বসাধারণের প্রশংসার অধিকারী ছিলেন।

বংশীধর রায়ের তিন পুত্র ;—জ্যেষ্ঠ শ্যামকান্ত, মধ্যম নীলকান্ত ও কনিষ্ঠ নিশিকান্ত। শ্যামকান্তের বিবাহ হইয়াছে ; অদ্য রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় শুভলগ্নে সরলার সহিত নীলকান্তের বিবাহ হইবে এবং নিশিকান্তের বিবাহ ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

বেশ জাঁকজমক করিয়া বর আসিল। তখন আর এখনকার মত দু'ঘোড়া তিনঘোড়া বা চার-ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বর বিবাহ করিতে আসিত না। এখনও যেমন বরের জন্য চতুর্দ্দোল, তাঞ্জাম, পাল্কী ও ক'নের জন্য মহাপায়া, ডুলীর চলন আছে,

তখনও তাই ছিল। ধনীর পুত্র চতুর্দ্দোল বা তাঞ্জামে এবং কন্যা মহাপায়ায় বিরাজ করিত। স্বল্পবিত্তের পুত্র পাল্কীতে এবং কন্যা ডুলীতে স্থান পাইত।

অষ্টাদশবর্ষীয় শ্রীমান্ নীলকান্ত রায় শ্রীমতী সরলাসুন্দরীকে জীবনের চিরসঙ্গিনী করিবার অভিলাষে শ্বশুরবাসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। কন্যাকর্ত্তা আত্মীয় স্বজনের সহিত সাদরে বরকে গ্রহণ করিল। অন্দরমহলে হুলুধ্বনি কুলুকুলু করিয়া সাড়া দিল। বর বাবাজীও বুঝিলেন, অর্দ্ধাঙ্গী তৈয়ার আছে। মনের আনন্দ মনেই চাপা রহিল, লোকলজ্জায় ফুটিতে পারিল না। কতক ফুটিবে বিয়ের পরে বাসব-ঘরে। তাও ঠিক্ বলা যায় না। কেন না বাসরাসর-সর্গরম্‌কারিণী রঙ্গিণী-গণের ঘোম্‌টাখোলা ন্যাংটা মুখের খৈ-ফুটুনির কাছে ছেলে বর তো দূরের কথা, অনেক বুড়ো বরও হাড়িকাঠে ঘাড় গুঁজ্‌ড়াইয়া পড়ে! আবার দুই একটা বাচ্চা বরও আচ্ছা করিয়া মুখ ফুটাইয়া রস ছুটাইয়া দেয়।

ধনেশ্বরের বহির্ব্বাটীর বৃহৎ ঠাকুরদালানে সভা সজ্জিত হইয়াছিল। বরকর্ত্তা বর লইয়া তথায় উপ-

স্থিত হইল। সজ্জিত বরাসনে বর বসিল। সভাস্থলে বরযাত্রগণ বিরাজ করিল। দেখিতে দেখিতে কন্যা-যাত্রিগণেরও ভিড় হইল। গ্রামের ছেলেপিলেরাও প্রবেশাধিকার পাইল। নূতন খেলো হুকায় ঘন ঘন গুড়ুক পুড়িতে লাগিল। পানের রেকাবী ইত-স্ততঃ ঘুরিতে আরম্ভ করিল। বরমজ্‌লিসে নানা-বিধ তর্ক-বিতর্ক, কথা বার্ত্তার স্রোত ছুটিতে লাগিল। এক ঘণ্টা কাল এইরূপে কাটিল।

এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া ধনেশ্বরকে সংবাদ দিল, "আপনার সঙ্গে পরিব্রাজক অচ্যু তানন্দ সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ কোত্তে চাচ্চেন।"

ধনেশ্বর সবিস্ময়ে বলিল, "অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী কে?"

ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে, তা আমি চিনি নি।"

ধনেশ্বর বলিল, "আচ্ছা, তাঁকে সঙ্গে কোরে নিয়ে আয়।"

ভৃত্য প্রস্থান করিল। কিয়ংক্ষণ পরে নূতন সংবাদ আনিল। বলিল, "সন্ন্যাসী ঠাকুর আপ-নাকে কি একটি বিশেষ গোপনীয় ও দরকারী কথা

বোল্‌বেন, তাই তিনি ভিড়ের মধ্যে আস্‌তে চান্ না। আপনাকে ডাক্‌চেন।”

“আচ্ছা” বলিয়া ধনেশ্বর সিংহ রায় সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিল।

যে দুই জন সন্ন্যাসী কালীবাড়ীর মাঠে অশ্বত্থ-তলে উপবিষ্ট ছিল, তাহাদের মধ্যে যে সন্ন্যাসীটি দীর্ঘত্রিশূলধারী, এটি সেটি। ক্ষুদ্রত্রিশূলধারী সন্ন্যাসীকে কালীবাড়ীর নাটমন্দিরের মধ্যে বসিতে বলিয়া নিজে ধনেশ্বরের বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত।

ধনেশ্বর বরাবর বহির্দ্বারে আসিয়া দেখিল, অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। জিজ্ঞাসিল, “আপনিই পরিব্রাজক অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী?”

সন্ন্যাসী ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, “হাঁ।”

ধনেশ্বর প্রশ্ন করিল, “আপনার মঠ কোথায়?”

সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, “চন্দ্রশেখর তীরথ্‌মে।”

ধ। কোথায় যাবেন?

স। কাশী।

ধ। উত্তম। এখানে কি প্রয়োজনে?

স। ম্যায় শুনা থা, আজ্ তুমারা লড়্‌কী কি

শুভ বিবাহ হোগা। তুমারা আউর তুমারা কন্যা কি মঙ্গলকে লিয়ে, তুম্‌কো এক বাৎ কহনেকো আয়া হু।

ধ। আজ্ঞা করুন্।

স। ম্যায় গণনা কর্‌কে দেখা হুঁ যো, তুমারা লড়্‌কী কি কারণ এক প্রজাপতি যাগ করনা চাহি। নহি তো ইহ বিবাহমে তুমারা কন্যা সুখিনী নহি হোয়গি।

সন্ন্যাসীর মুখে এরূপ কথা শুনিয়া কাহার না বিশ্বাস হয়? এ বিবাহে কন্যা সুখিনী হইবে না, ইহা পিতার প্রাণে সুখের কথা নহে। সুতরাং ধনেশ্বর ব্যগ্রতাসহকারে সন্ন্যাসীকে বলিল, "সে যাগ কে কোর্‌বে? কোথায় হবে? কি কি চাই?"

স। ম্যায় করুঙ্গা। তুমারা কালীবাড়ীমে হোগা। ঘৃত, তিল, কদলী, ফুল, যব, সিন্দূর, চন্দন আউর একঠো নয়া বস্ত্র চাহি।

ধ। আচ্ছা, তাই হবে। আর কিছু চাই?

স। আর কুছ্ নেঁহি চাহি। এহি সব উপকরণ সমেত তুমারা লড়্‌কীকো লেকে কালীবাড়ীমে তুম্‌কো জানে হোগা।

কন্যার মঙ্গল হইবে, অথচ তেমন কোন ব্যয় ভূষণ নাই। ধনেশ্বর তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। প্রজাপতি যাগের সমস্ত আয়োজন করিয়া, অন্দর-মহলে গেল। ভামিনীকে সমস্ত কথা বলিল। ভামিনী তৎক্ষণাৎ সরলাকে স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিল। ধনেশ্বর যাগদ্রব্য ও জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে লইয়া কালীবাড়ী চলিল। সঙ্গে কএক জন লোক চলিল। অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। দেখিতে দেখিতে সকলে কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিল। নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে যথাবিধানে যাগারম্ভ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

কালীবাড়ীর বৃহৎ নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী যজ্ঞকুণ্ডে যজ্ঞডুম্বুরের শুষ্ককাষ্ঠখণ্ডগুলি জ্বালিয়া ঘৃতাহুতি দিতে লাগিল। একবার যব, একবার তিল, একবার ফুল, একবার বা কাঁঠালী কলা গব্যঘৃতে ম্রক্ষিত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। নাটমন্দির ধূপ ধূনার গন্ধে আমোদিত ও শঙ্খঘণ্টার বাদ্যে আরাবিত হইয়া উঠিল। ধনেশ্বর সিংহ রায় বধূবেশিনী জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে লইয়া যজ্ঞকুণ্ডের একপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিল। ধনেশ্বরের লোকগুলি নাটমন্দিরের ইতস্ততঃ দাঁড়াইয়া, প্রজাপতি যাগ দেখিতে লাগিল। আর এক জনও নাটমন্দিরের দূরে অথচ একপার্শ্বে বসিয়া, যাগ দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল,—তাহার গুরুদেবই এই যাগের হোতা, ব্যাপার কি? বোধ হয়, এই বুঝি শিষ্যের চিত্তপরীক্ষা।

নাটমন্দিরে এইরূপে যাগকর্ম্ম চলিতেছে।

এ দিকে এমন সময়ে কালীবাড়ীর বাহিরের মাঠে বিবাহের বাদ্যরব উঠিল। কোন্ গ্রাম হইতে কোন্ গ্রামে অপর একটি বর যাইতেছিল। বর ও বরযাত্রগণের সামুটী গ্রামের মধ্য দিয়া, গন্তব্য স্থানে যাইবার সুবিধা, তাই তাহারা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। খুব জাঁকালো বর, প্রায় হাজারো লোক। দলে দলে বাদ্যকারগণ, আ-লোকধারিগণ, সামগ্রীসম্ভারবাহকগণ,পাল্কীতাঞ্জাম-বাহকগণ ও বরযাত্রগণ কালীবাড়ীর মাঠ ভরিয়া ফেলিল। চল্লিশ পঞ্চাশ খানা পাল্কী ও ডুলী। সমস্তই ঘেরাটোপে ঢাকা। একখানি সুন্দর তাঞ্জামের উপর চতুর্বিংশবর্ষীয় বর উপবিষ্ট।

ও দিকে নাটমন্দিরের মধ্যে বসিয়া, বাহিরের বাদ্যকোলাহল শুনিয়া ধনেশ্বর ভৃত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাইরে কিসের বাদ্যি রে ?"

ভৃত্যগণ বলিল, "আজ্ঞে, দেখে এসে বোল্‌চি।"

এমন সময়ে আর দুই তিন জন ভৃত্য বাহির হইতে নাটমন্দিরে আসিল। ধনেশ্বর তাহাদি-গকেও সেই প্রশ্ন করিল। তাহারা উত্তর করিল, "আজ্ঞে, কাদের বর যাচ্চে। মাঠে দম্ নিচ্চে।"

ধনেশ্বর পুনর্ব্বার যাগে মনোযোগ দিল। অপরিচিত বরযাত্রদের মধ্য হইতে চার পাঁচ জন লোক কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, আনন্দময়ীকে প্রণাম করিল, নাটমন্দিরের সিঁড়িতে উঠিয়া যাগ দেখিল। আবার তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া, মাঠস্থ লোকদের সহিত মিশিল। মিশিয়াই তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কি একটা সঙ্কেতধ্বনি করিল! যেমন সঙ্কেতধ্বনি, অমনি সেই হাজার লোকের কণ্ঠে ভয়ঙ্কর চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল। সে চীৎকার, যে সে চাৎকার নহে, ডাকাতের বিকট চীৎকার। একটার পর একটা, এইরূপ মুহুর্মুহু চীৎকার হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই সকল লোক, মায় বরটি পর্য্যন্ত, প্রবল বেগে ও দুঃসাহসিক আবেগে, সমস্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত পাল্কী ডুলী হইতে শত শত নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র বাহির করিয়া, বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের ন্যায়, কালীবাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাদের অনিবার্য্য বেগে ও রাগে দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল, প্রাচীর পড়িয়া গেল। সশস্ত্র অনেক লোক ভিতরে ঢুকিল, অনেকে কালীবাড়ীর বাহিরের চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ফেলিল। আবার

অনেকের হস্তে ঘন ঘন পিস্তলের অওয়াজ হইতে লাগিল।

ভয়ঙ্কর ঘটনা! লোমহর্ষণ ঘটনা! অদ্ভুত ঘটনা! অলৌকিক ঘটনা! সামৃটী গ্রাম কাঁপিয়া উঠিল! একটানা আনন্দস্রোত, ভয়ে বিস্ময়ে ধাঁধায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মিশিয়া গেল।

যে সকল অস্ত্রধারী লোক কালীমন্দিরে প্রবেশ করিল, তাহাদের তাৎকালিক মুর্ত্তি দেখিয়া, চীৎকার শুনিয়া মরা মানুষও ভয় পায়, জীবন্তের তো কথাই নাই। সভৃত্য ধনেশ্বর সিংহ রায় ভয়ে আড়ষ্ঠ হইয়া গেল! বালিকা সরলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল!

প্রবিষ্ঠ অস্ত্রধারীদের মধ্যে অনেকগুলি লোক বিদ্যুদ্বেগে নাটমন্দিরে উঠিয়া পড়িল। তন্মধ্য হইতে একজন অতিবলিষ্ঠ লোক ধনেশ্বরকে ধরিয়া ফেলিল। আর একজন, অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীর হস্তে একখানি শাণিত তরবারি দিল। যজ্ঞকারী সন্ন্যাসীকে তরবারিধারী দেখিয়া, ধনেশ্বরের ভয়ের উপর ভয়, বিস্ময়ের উপর বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল। মনে দারুণ সন্দেহ জাগিল। কিন্তু উৎকট

আতঙ্কে বাগ্‌রোধ হইয়া গেল; কথা কহিতে পারিল না।

ভৃত্যগণ প্রাণের ভয়ে কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু পলাইবার উপায় নাই। ভয়-ব্যাকুলা সরলাকে একজন অস্ত্রধারী কোলে তুলিয়া, "ভয় নেই, মা! ভয় নেই" বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। বালিকার মন কিন্তু তা বুঝিল না।

এমন সময়ে অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী হঠাৎ তীক্ষ্ণ তরবারি উত্তোলন করিয়া, ধনেশ্বরকে গম্ভীর গর্জ্জনে বলিল, "তোমাকে আজ পাপের উপযুক্ত ফলভোগ কোত্তে হবে।"

এইবার ধনেশ্বর প্রাণের দায়ে ভয়-ব্যাকুলিত স্বরে বলিল, "আমি কি পাপ কোরেচি?"

অচ্যুতানন্দ। তুমি সামান্য ধন-লোভে দুইটা গুরুতর মহাপাপ কোরেচো।

ধ। (সবিস্ময়ে) কি দুইটা গুরুতর পাপ?

অ। একটা শোন।—যাদবেন্দ্র রায় নামে একটি দরিদ্র যুবা তোমার এই জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে পুষ্করিণীর জল থেকে তুলে প্রাণদান কোরেছিলো কি না?

ধ। হাঁ কোরেছিলো।

অ। তার প্রত্যুপকারস্বরূপ তুমি তার সঙ্গে তোমার এই কন্যা সরলার বিবাহ দিতে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলে কি না?

ধ। (মনের ভাব গোপন করিয়া) কই, তা তো

অ। (সরোষে) আমার তরবারির দিকে চেয়ে কথা কও।

ধ। (সভয়ে) হাঁ, মনে হয়েচে। যাদবেন্দ্রের সঙ্গে সরলার বিবাহ দিতে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম।

অ। প্রতিজ্ঞা পূরণ কোরেচ কি?

ধ। না।

অ। কেন?

ধ। যাদবেন্দ্র দরিদ্র।

অ। প্রতিজ্ঞার কাছে ধনী দরিদ্র কি?

ধ। আমার কন্যা পাছে কষ্টে পড়ে, তাই।

অ। যে ব্যক্তির দয়া স্নেহ তোমার কন্যাকে জীবন দান কোরেচে, তার সেই দয়া স্নেহ কি তাকে পথের ভিখারিণী কোত্তো?

ধ। হাঁ,—তা বটে—তবু—

অ। (পুনর্ব্বার সরোষে) তুমি আর বৃথা বাক্য

ব্যয় কোরো না। তুমি নিতান্ত ধনলোভী। ধনের জন্য ধনেশ্বর না কোত্তে পারে, এমন কার্য্যই জগতে নাই। ধনী জামাতার পিতার নিকট অপর্য্যাপ্ত ধনলাভ কোর্ব্বে বোলে, ধর্ম্মতঃ দরিদ্র জামাতার মনোভঙ্গ কোরেচো, তাকে নির্জ্জীব কোরেচো। তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেরও ঘোরতর অপমান কোরেচো। আমি সকল সহ্য কোত্তে পারি, কিন্তু ধর্ম্মের অপমান কথনই সহ্য কোত্তে পারি না।"

অচ্যুতানন্দের এই সুকঠোর ভৎর্সনায় ধনেশ্বরের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া অচ্যুতানন্দ আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। বলিল, "আর বিলম্ব কোত্তে পারি না। হয় তুমি যাদবেন্দ্রের হস্তে তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে, সর্ব্বসাক্ষিণী আনন্দময়ীর সমক্ষে সম্প্রদান কর, নয় অচ্যুতানন্দের তীক্ষ্ণতরবারিধারে মস্তকচ্যুত হও।"

এ ভয় বড় ভয়। ধনেশ্বর এই কথা শুনিয়া কি এক রকম হইয়া গেল। একটু ভাবিয়া বলিল,

"শ্রীমান্ নীলকান্ত রায়ের হস্তে সরলাকে সম্প্রদান কোত্তে বাগদত্ত হোয়েচি, এখন তাঁর অন্যথা কোল্লে আমার অধর্ম্ম হবে যে।"

অচ্যুতানন্দ এইবার তীব্র বিদ্রূপরোষে বলিল, "তোমার ধর্ম্ম তো সকল কাজেই জাজ্বল্যমান্! নীলকান্তকে বাগ্দান করবার পূর্ব্বে যাদবেন্দ্রকে কি বাগ্দান করনি? হে ধার্ম্মিকচূড়ামণি! এতই যদি তোমার ধর্ম্মভয়, তবে বল দেখি, যাদবেন্দ্র তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামী, কি নীলকান্ত?"

ধনেশ্বর পুনর্ব্বার নির্ব্বাক্।

অচ্যুতানন্দ, উত্তরের বিলম্ব দেখিয়া, সরোষে বলিল, "যাদবেন্দ্রের সহিত সরলার বিবাহ দেবে কি না? বল—বল—নৈলে—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া অসি উত্তোলন করিল।

আর উপায় নাই'। তৎক্ষণাৎ অসির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধনেশ্বর বলিয়া ফেলিল, "দেবো দেবো।" এই বলিয়া আবার বলিল,' যাদবেন্দ্র তো আমার নিকটে নাই। কিরূপে সম্প্রদানকার্য্য হবে?"

অচ্যুতানন্দ বলিল, "মা আনন্দময়ী এখনি যাদবেন্দ্রকে এখানে এনে দেবেন।"

এই বলিয়াই অচ্যুতানন্দ ডাকিল—"যাদবেন্দ্র!"

আহ্বান মাত্রেই ক্ষুদ্র ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী, নাটমন্দিরের অপরপার্শ্ব হইতে "প্রভু!" এই সম্বোধন সহকারে অচ্যুতানন্দের সম্মুখে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। গুরুজীর কাণ্ডকারখানা দেখিয়া যাদবেন্দ্র এতক্ষণ স্তম্ভিত ও অবাক্ হইয়া দূরে দাঁড়াইয়াছিল। ভাবিতেছিল, "আমার গুরুজী কে? বরাবর আমার কাছে হিন্দী কথা কইতেন, এখন আবার বাঙ্‌লা কথা কইচেন। বরাবর একাকী আমার কাছে আস্‌তেন, থাক্‌তেন, আজ ইনি এত লোক পেলেন কোথা? যে সে লোক নয়, সবাই অস্ত্রধারী বীর। বরাবর গুরুজী আমাকে বোল্‌তেন, 'তোর যখন বিবাহ হয় নি, তখন তুই আমার শিষ্য হবার যোগ্য।' আজ আবার বিকালবেলায় মাঠের পথে বোলেছিলেন, 'তুই যদি ধনেশ্বরের কন্যা সরলার বিবাহ দেখে চঞ্চল না হোস্, তবে তোকে যোগাভ্যাস করাবো, নৈলে শিষ্যত্ব থেকে খারিজ কোর্ব্বো।' কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ যে এক ঘোর গোলোকধাঁধায় পোড়লেম। গুরুজী আমারই হস্তে সরলা সম্প্রদানের

উদ্যোগী। তাই তো, অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী কে? নিশ্চয় দেবতা।"

যাদবেন্দ্র গুরুদেবের নিকট দাঁড়াইল। গুরুদেব শিষ্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এবং নিজের স্বর্গীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিবার জন্য ধনেশ্বরকে বলিল, "এর হস্তে তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে আমাদের সমক্ষে ধর্ম্মরূপিণী আনন্দময়ীকে সাক্ষী করিয়া, সম্প্রদান কর।"

ব্যাপার দেখিয়া ধনেশ্বর ও ধনেশ্বরের লোকেরা অবাক্। দেখিয়া শুনিয়া ধনেশ্বর বলিল, "যাদবেন্দ্র কই? এ যে সন্ন্যাসী!" এই বলিতে বলিতে ধনেশ্বরের চক্ষে জল আসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীকে বলিল, "হায় হায়, তোমার মনে কি এই ছিল! আমার স্নেহের সরলাকে গৃহহীন, ধনহীন, সংসারের সকল সুখভোগহীন একজন সন্ন্যাসীর হাতে ফেলে দিলে!"

অ। আমি তোমার ন্যায় প্রবঞ্চক নই। এই সেই যাদবেন্দ্র। এই-ই তোমার সেই জ্যেষ্ঠ জামাতা।

এই বলিয়া অচ্যুতানন্দ নিজ কমণ্ডলু হইতে

জল লইয়া শিষ্যের মুখ ধুইয়া দিল। শিষ্য অধো-বদনে লজ্জায় দাঁড়াইয়া রহিল।

এই ছিল শিষ্য, এই হইল যাদবেন্দ্র রায়। ধনেশ্বর তাহার ধৌত মুখ দেখিয়া অবাক্ হইল।

অচ্যুতানন্দ ধনেশ্বরকে বিদ্রূপবাক্যে বলিল, "কেমন, সন্দেহ মিট্‌ল কি? না মিটে থাকে তো তরবারির মুখে মেটাই।"

ধনেশ্বর কোন উত্তর করিল না। দুঃখ, ভয়, লজ্জায় স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরলার সুকোমল দক্ষিণ হস্তটি শ্রীমান্ যাদবেন্দ্র রায়ের দক্ষিণ হস্তে রক্ষা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিল, "দেবী আনন্দময়ী সাক্ষী, ধর্ম্মসাক্ষী, শ্রীমান্ যাদবেন্দ্র রায় বাবাজীউর হস্তে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরলাকে সম্প্রদান কোল্লেম।"

সম্প্রদানকার্য্য হইবামাত্র অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী ও তাহার দলবল আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল।

অনন্তর অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী ধনেশ্বরকে বলিল, "তোমার পাপের একটা প্রায়শ্চিত্ত হলো, এখনো একটা বাকি। কিন্তু সেটা হবার আগে, মাঝে আর একটা কাজ কর।"

ধ। আবার কি?

অ। নীলকান্ত রায় তোমার বাড়ী এসে, পিতার সহিত ভগ্নহৃদয়ে, বিষণ্নমনে, মলিনমুখে যে ফিরে যাবে, সেটা আমাদের সহ্য হবে না। তুমি এখনি তোমার লোক পাঠিয়ে, তোমার বাড়ীর বরসভা থেকে পিতার সহিত তাকে আনাও। তোমার কনিষ্ঠা কন্যা তরলা ও পত্নী ভামিনীকে আনাও। এই আনন্দময়ীর সমক্ষে শ্রীমান্ নীলকান্ত রায়ের হস্তে শ্রীমতী তরলাকে সম্প্রদান কর। শীঘ্র লোক পাঠাও।

ধনেশ্বর তাহাই করিল। অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী কি একটা সঙ্কেত করিল। সেই সঙ্কেতের গুণে তাহার অস্ত্রধারী লোকেরা ধনেশ্বরের ভৃত্যগণকে ছাড়িয়া দিল।

অল্পক্ষণ পরে পিতার সহিত নীলকান্ত রায় ও জননীর সহিত তরলা আসিল। আসিয়াই ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। কিন্তু অচ্যুতানন্দের সান্ত্বনা ও অভয়-স্রোত ছুটিতে লাগিল।

পাঠক পাঠিকারা বলিতে পারেন যে, কালী-বাড়ীর এই দুর্ঘটনা দেখিয়া ও জানিয়াও বরসভায়

এখনো লোকেরা কি করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল? পলায়ন করে নাই কেন? কিন্তু পলাইবার পথ যে ছিল না। অচ্যুতানন্দের অনেক অস্ত্রধারী বীরেরা ধনেশ্বরের বাড়ী ঘেরিয়া রাখিয়াছিল।

অনন্তর অচ্যুতানন্দের আদেশে ধনেশ্বর সিংহ রায় শ্রীমান্ নীলকান্ত রায়ের হস্তে নিজ কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী তরলা সম্প্রদান করিল।

এই বার অচ্যুতানন্দ গম্ভীর স্বরে পুনর্ব্বার ধনেশ্বরকে বলিল, "এই বার তোমার দ্বিতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। তোমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধেকাংশ আমাকে দাও।"

ধনেশ্বর চমকিয়া উঠিল। বলিল, "সে কি!"

অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী বলিল, "আমি তোমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি নিয়ে, তার মধ্যে নগদ টাকার চার ভাগের এক ভাগ আমার এই সকল পরমোপকারী ও পরমসহায় সহচরদের দেবো। বাকী তিন ভাগ নগদ টাকা এবং সমস্ত অর্দ্ধেক ভূসম্পত্তি আমার এই পরমস্নেহের পাত্র ও শিষ্য শ্রীমান্ যাদবেন্দ্র রায়কে প্রদান কোর্‌বো।"

এই কথা শুনিয়া ধনলোভী ধনেশ্বর মরিয়া গেল

কি বাঁচিয়া রহিল, তাহা বুঝিতে পারে এমন নাড়ী-বিজ্ঞ চিকিৎসক খুঁজিয়া পাওয়া ভার। ধনেশ্বরের মুখ শুকাইল, বুক শুকাইল। সুখ তো অগ্রেই শুকাইয়া ঝলসিয়া গিয়াছে! আকুলপ্রাণে ব্যাকুল-ভাবে বলিল, "আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তো জোর কোরে যাদবেন্দ্রের হস্তে দিলে। শেষে জোর কোরে আমার ধনসম্পত্তিরও অর্দ্ধেক নেওয়া কি ধর্ম্মসঙ্গত?"

অচ্যুতানন্দ ধনেশ্বরের কথার শেষাংশটা শুনিয়া ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে ধনে-শ্বরের প্রাণ উড়িয়া গেল। চক্ষে যেন অন্ধকার দেখিল। ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মুখে আর কথা ফুটিল না।

গর্জ্জিত অচ্যুতানন্দ তীক্ষ্ণ তরবারি উত্তোলন করিয়া ধনেশ্বরকে বলিতে লাগিল, "কি বলিলে? ধর্ম্মসঙ্গত? কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা! মহা-পাপিষ্ঠ মহানারকী মহা-অধার্ম্মিক ধনেশ্বর সিংহ রায় অচ্যুতানন্দকে অধার্ম্মিক বোল্‌তে সাহস করে! শোনো, ধনেশ্বর! অধার্ম্মিক আমি নই, অধার্ম্মিক তুমি! অধার্ম্মিক তোমার প্রাণ! অধার্ম্মিক তোমার

মন! অধার্ম্মিক তোমার আত্মা! অধার্ম্মিক তোমার কর্ম্ম! অধার্ম্মিক তোম্যর ধর্ম্ম! অধার্ম্মিক তোমার কায়া! অধার্ম্মিক তোমার ছায়া! তুমি অধর্ম্মে শত শত লোকের সর্ব্বনাশ কোরেচো—কত লোককে পথের ভিখারী কোরেচো—কত অবলা বালার চক্ষে অশ্রুপ্রস্রবণ সৃজন কোরেচো—কত শত দীনহীন দরিদ্র প্রজার এক মুষ্টি অন্ন, একখানি বস্ত্রেরও সংস্থান রাখ নি। তুমি দুর্ব্বৃত্ত, নারকী, পিশাচ, দস্যু!"

ধনেশ্বর উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় অস্থির হইল। অচ্যুতানন্দের এই তীব্র মর্ম্মভেদী বাক্যকুঠারে তার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত যেন কোটি খণ্ডে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল।

পুনর্ব্বার সেই তীক্ষ্ণতরবারিধারী সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণতর বাক্যে গর্জ্জন করিল। বলিল, "আর বিলম্ব কোত্তে পারি নি। এই কাগজ, কলম, দোয়াত লও। আমার শিষ্য যাদবেন্দ্রের নামে তোমার অর্দ্ধেক ধনসম্পত্তির দানপত্র লেখ।" এই বলিয়া নিজ-কুক্ষিলম্বিত ভিক্ষার ঝুলী হইতে কাগজ, কলম, দোয়াত বাহির করিয়া দিল।

ধনেশ্বর দেখিল, বিভ্রাট ও সর্ব্বনাশের তো আর বাকী নাই। যদি না লেখে মস্তক যাবে। উপায় নাই। তথাপি ধনের মায়ায় বিমোহিত হইয়া, প্রাণের মায়া কতকটা ভুলিয়া গেল। বলিল, "অর্দ্ধেক নয়, দুই আনা অংশ দানপত্রে লিখে দিচ্চি।"

অচ্যু। বটে! এখনও যে তোমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি অধিকার কচ্চি নি, এই তোমার পরম সৌভাগ্য। ফের্ যদি আপত্তি কর, তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দানপত্রে লিখিয়ে নেবো।"

সর্ব্বনাশ! ধনেশ্বর আর কথাটিও ফুটিয়া বলিল না। অচ্যুতানন্দের আদেশানুসারে দানপত্র লিখিল। নিজের নাম সহি করিল। নাম সহি করিবার সময় চক্ষু ফুটিয়া কএক বিন্দু অশ্রু কাগজের উপর টপ্ টপ্ করিয়া পড়িয়া গেল। তার পর অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীর আদেশে ধনেশ্বরের লোকেরা এবং নীলকান্ত রায়ের পিতা সাক্ষী হইয়া, সেই দানপত্রে স্ব স্ব নাম সহি করিল। অচ্যুতানন্দ দানপত্রখানি লইয়া, "জয় মা আনন্দময়ী!" বলিয়া, নিজের নিকট যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিল। ধনপিশাচ

ধনেশ্বরের দ্বিতীয় দফা প্রায়শ্চিত্ত হইল! দফা রফা হইল!

যাদবেন্দ্র রায়ের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহ ঘটিয়া গেল, তাহাতে ধনেশ্বর তত দুঃখিত হয় নাই, কিন্তু যাদবেন্দ্র যে শেষে তাহার অর্দ্ধৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইল, ইহা বড়ই অসহ্য হইল। বুক ফাটিয়া গেল। ধনেশ্বর আর থাকিতে পারিল না; কপালে সবলে করাঘাত করিয়া, সরলার মুখপানে চাহিয়া, গভীর যন্ত্রণায় বলিয়া ফেলিল, "হা বাঘিনি! তুই আমার যত সর্ব্বনাশের মূল! কেন তুই বাঘিনীর মুখ থেকে বেঁচেছিলি? কেন তোকে শিকারীরা আমার বাড়ীতে এনেছিল? কেন আমি আমার পত্নীর অনুরোধে তোকে লালন পালন কোরেছিলেম—নিজের কন্যার মত স্নেহ কোরেছিলেম? পুষ্করিণীতে ডুবেছিলি তো মরিলি নি কেন? তুই মর্‌বি কেন? আমাকে ধনে প্রাণে মার্‌বি বোলে আমার ঘরে ঢুকেছিলি! বাঘিনীর গ্রাসেও যার প্রাণ নাশ হয় নি, সে যে আমার সর্ব্বনাশিনী হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি?"

ধনেশ্বরের মুখে এই অভূতপূর্ব্ব কথা শুনিয়া

অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী অত্যন্ত বিস্মিত হইল। মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কি জাগিয়া উঠিল। অচ্যুতানন্দের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিল। ব্যগ্রতা ও কৌতূহল সহকারে বলিল, "কি বলিলে? সরলা তোমার আপন কন্যা নয়? বাঘিনীর গ্রাসে থেকে শিকারীরা একে এনে তোমায় দিয়েছে? সত্য কথা?"

ধ। সত্য কথা।

অ। কত দিনের কথা?

ধ। আজ নবম বৎসর চোল্‌চে।

অ। যখন শিকারীরা একে আনে তখন কি মাস?

ধ। পৌষ মাস।

এই কথা শুনিয়া অচ্যুতানন্দ আরো চঞ্চল হইল। যেন মনে ভাব জাগিবার অগ্রেই জিহ্বায় কথা ফুটিল। বলিল, "আচ্ছা, সে সময়ে এর অঙ্গে কোন অলঙ্কার ছিল?"

ধনেশ্বর কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিল, "ছিল।"

অ। কি?

ধ। গলায় পৈতার সুতায় বাঁধা একটা বড় রূপার মাদুলী।

অ। সে মাদুলীটা কোথা? আছে কি?

ধ। আছে; কিন্তু আমার কাছে নয়।

অ। কোথা তবে?

ধ। (আনন্দময়ী প্রতিমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) আনন্দময়ীর দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে সে মাদুলীটা ঝোলান আছে।

অ। কি অভিপ্রায়ে?

ধ। এই কন্যা ব্যাঘ্রীর গহ্বর থেকে প্রাণ পেয়েছিল বোলে, আমার পত্নী, আনন্দময়ীর ষোড়শোপচারে পূজা দিয়েছিলেন, এবং এর মঙ্গলোদ্দেশে এর সেই মাদুলীটিও আনন্দময়ীর হস্তে বরাবর ঝুলিয়ে রাখ্‌তে, ইচ্ছা কোরেছিলেন। কার্য্যেও তাই করা হোয়েছিল।

অ। সেই মাদুলীটি একবার দেখ্‌তে চাই। পুরোহিতকে আন্‌তে বলুন।

অনন্তর ধনেশ্বরের আদেশে পুরোহিত ঠাকুর আনন্দময়ীর হস্ত হইতে রূপার মাদুলীটি খুলিয়া আনিল। অচ্যুতানন্দ তাড়াতাড়ি উহা লইয়া,

বিশেষ করিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মনোমধ্যে কি জাগিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ মাদুলীটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ভাঙ্গিবা-মাত্র তন্মধ্য হইতে একখানি ভূর্জ্জপত্রলিখিত রক্ষাকবচ বাহির হইল। অচ্যুতানন্দ তৎক্ষণাৎ একজনকে একটা দীপ উঠাইয়া ধরিতে বলিল। তাহাই হইল। তখন অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী রক্ষাকবচ মনে মনে পড়িতে লাগিল। পাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বে হইতেই অচ্যুতানন্দের ভাবান্তর ঘটিতেছিল। এইবার সেই অবস্থা পূর্ণসীমা স্পর্শ করিল। অচ্যু-তের মুষ্টি হইতে তীক্ষ্ণ তরবারি বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। এ অচ্যুতানন্দ যেন আর সে অচ্যুতানন্দ নয়। কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সপ্ত সাগরে দেহ, প্রাণ, মন, আত্মা, ভাব, আশা ভরসা, স্নেহ, মায়া সমস্তই যুগপৎ ভাসিতে লাগিল। অচ্যুতানন্দ সেই অনিবার্য্য আনন্দবেগে এবং সেই বেগজনিত অশ্রুপূর্ণ নয়নে "মা আমার, বেঁচে আছিস্! বেঁচে আছিস্! আয় মা কোলে আয়। তোর চিরশোকসন্তপ্ত পিতার কোলে আয়!" এই বলিয়া সরলাকে কোলে তুলিয়া লইল। স্নেহভরে

ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী অচ্যুতানন্দের আনন্দের সীমা নাই—স্নেহের অবধি নাই—ভাবের অভাব নাই। সন্ন্যাসীর অচ্যুতানন্দ-নাম আজ সার্থক হইল। বাস্তবিক পৃথিবীর অচ্যুতানন্দ আজ স্বর্গের অচ্যুতানন্দ। ক্ষণকাল তরে সন্ন্যাসী সমস্ত ভুলিয়া গেল, কেবল চতুর্দ্দিক সরলাময় দেখিতে লাগিল। আবার ঘন ঘন সরলার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। এক বার বলিয়া উঠিল, "আজ আমি ধন্য হোলেম! বিধি হারানিধি মিলিয়ে দিলেন। ঐ মন্দিরমধ্যে আনন্দময়ী! এই আমার কোলেও আনন্দময়ী!"

এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলে যার পর নাই বিস্মিত হইল। সে বিস্ময়ের কথা আমার একটি লেখনী তো অতি তুচ্ছ, শত শত লেখনীমুখেও ফুটিতে পারে না। "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি অদ্ভুত ঘটনা!" এই কথারই ঘন ঘন তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

ধনেশ্বর তো মর্ম্মে মরিয়াছিল, কিন্তু সেও অবাক্ হইয়া একবার সন্ন্যাসীর মুখপানে, একবার সরলার মুখপানে চাহিতে লাগিল। তাহারও ভেগ্ন-

মনে বিস্ময় ভরিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ বিস্মিত ধনেশ্বর কৌতূহলবিহ্বল হইয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

সন্ন্যাসীর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, তাহার পার্শ্ব হইতে এক ব্যক্তি উত্তর করিল, "ইনি আমাদের দলপতি ভীমভাম!" উত্তরদাতা লোকটি সন্ন্যাসীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ সেই স্বরূপ।

ধনেশ্বর আরও বিস্ময়ের সহিত বলিল, "ভীম ভাম কে?"

এ বার সন্ন্যাসী অপরের উত্তর দিবার অগ্রে নিজে আনন্দোন্মত্ত হইয়া বলিল, "আমি ভীম-ভাম নই—আমি আপনার কনিষ্ঠ সহোদর রত্নেশ্বর সিংহ রায়।" এই বলিয়া অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী ধনেশ্বরের পদতলে পতিত হইল। কমণ্ডলুজলে নিজ মুখ প্রক্ষালন করিয়া, কৃত্রিম জটা-জূট ও সন্ন্যাসিবেশ খুলিয়া ফেলিল।

তদ্দর্শনে সকলের মনে বিস্ময়ের উপর বিস্ময় দ্বিগুণীকৃত হইল। ধনেশ্বর ও ভামিনী রত্নেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক্ হইয়া গেল। আর কালবিলম্ব না করিয়া, ধনেশ্বর অতিশয় হর্ষভরে,

"ভাই রে! ভাই রত্নেশ্বর রে! আয় আয়" বলিয়া ঘন ঘন আলিঙ্গন করিতে লাগিল। ভামিনী বিস্ময়ানন্দে বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ, ঠাকুরপো!"

স্বরূপ প্রভৃতি দস্যুগণও আনন্দে বিভোর হইয়া গেল। তাহাদের দলপতি ভীমভাম জমীদার ধনেশ্বরের কনিষ্ঠ সহোদর! ইহা আশ্চর্য্যের অপেক্ষা আশ্চর্য্য! তাই স্বরূপ নিতান্ত উৎফুল্ল চিত্তে ও প্রফুল্ল মুখে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভাই ভীম! এখন নিশ্চয় বুঝ্‌লুম, তুমি যে সে ডাকাত নও,—অদ্ভুদ ডাকাত!

রত্নেশ্বর ঈষৎ হাস্য করিল।

আবার স্বরূপ সহাস্যে বলিল, "ধন্য ভাই, তোমার চতুরালী! তোমার চতুর বুদ্ধির কাছে সবাই হার মেনেচে। তোমার জমীদার দাদা, তোমার ভাজ, তোমার চেলা ওরফে জামাই, আর তোমার এই স্বরূপ, পাঁচু প্রভৃতি হাজারো সঙ্গী আজ ন্যাকা ভ্যাকা! সাবাস্ ভাই! বলিহারি যাই! তোমার ছদ্মবেশের কূলকিনারা নাই। সাবাস্ ভাই ভীমভাম! বাহবা অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী ঠাকুর! ধন্য শ্রীযুক্ত বাবু রত্নেশ্বর সিংহ রায় মহাশয়!

রত্নেশ্বর একটু লজ্জার হাসি হাসিলেন।

ধনেশ্বর বলিল, "ভাই রে! ধর্ম্মেরই জয় হয়, তাই আজ তোকে পেলেম, তুইও আমাকে পেলি। একমাত্র ধর্ম্মের অমোঘশক্তিতে আমাদের উভয়েরই ফললাভ হ'ল। আমার ফল—পরাজয়, তোমার ফল—জয়। ঋষিবাক্য মিথ্যা নয়—

"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।"

স্বরূপ সপরিহাসে ধনেশ্বরকে বলিল, "তাই আপনার আজ আষ্টেপিষ্টে দুর্গতি!"

ধনেশ্বর স্বরূপকে বলিল, "তোমার কথা মিথ্যা নয়। আমি আমার কনিষ্ঠ সহোদর রত্নেশ্বরকে যার-পর-নাই দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়েছি। পৈত্রিক ধন-সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক রত্নেশ্বরের। কিন্তু আমা হেন নীচ ধনলোভী মহাপাতকী নারকী কি গর্হিত কার্য্যই না করেছে। আমার ভাই আমারই কলকৌশলে ছলে বলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে, পথের ভিখারী হয়ে, পত্নীর সহিত চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিল। ভাই আমার এত দিন নিরুদ্দেশ হয়েছিল। আজ আমার পাপের সমুচিত শাস্তি হয়েচে!"

রত্নেশ্বর সলজ্জে ও সসম্ভ্রমে বলিলেন, "দাদা! যা হয়েচে, তা হয়েচে, তার আর উল্লেখ কর্ব্বেন্ না। আমি আজ আমার স্নেহের কন্যাকে আপনার কৃপাবলে পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে, সমস্ত মর্ম্মযন্ত্রণা ভুলে গিয়েচি। দাদা! আপনাদের দ্বারা আমাদের যত অনিষ্ট ঘটেচে, তার শতগুণ ইষ্টলাভও আজ হলো। ভাগ্যে আপনি সরলাকে লালনপালন কোরে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তাই তো আমি আবার আমার স্নেহের ধনকে পেলেম। দাদা! আমি আহত ভুজঙ্গের ন্যায় আপনাকে বিষবাক্যদংশনে যার-পর-নাই দংশন কোরেচি, নিতান্ত অন্যায় কোরেচি, আমায় ক্ষমা করুন্।" এই বলিয়া পুনর্ব্বার পদধারণ করিলেন।

ধনেশ্বর সস্নেহে কনিষ্ঠকে উঠাইয়া বলিল, "না, ভাই! তোমার কোন অপরাধ নাই। আমিই সম্পূর্ণ অপরাধী।"

ভামিনী সাগ্রহে বলিল, "ঠাকুর পো। কমলা কই?"

রত্নেশ্বর এবার বিমর্ষ হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কমলা এখন দ্রবময়ী।

এই বলিয়া অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে যাদবেন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে রত্নেশ্বরকে নিবেদন করিয়া বলিল,

"গুরুদেব! এই কি শিষ্যের চিত্তপরীক্ষা?"

রত্নেশ্বর ঈষদ্ধাস্য মুখে উত্তর করিলেন, "বৎস! আমি এইরূপেই চিত্তপরীক্ষা করি।"

স্বরূপ হাসিয়া বলিল, "উহুঁ, এর নাম চিত্ত-পরীক্ষে নয়। এর নাম ভাঙাকে গড়া। আমি জানি, গড়াকে অনেকে ভাঙ্‌তে পারে, যেমন বাবু ধনেশ্বর সিংহ রায় জমীদার মহাশয়, কিন্তু ভাঙাকে গড়্‌তে পারে, এমন লোক প্রায় পাওয়াই যায় না। আজ সৌভাগ্যের বশে এক জনকে পাওয়া গেল। তাঁর নাম

ভীমভাম!

অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী!

রত্নেশ্বর সিংহ রায়!

বা

অদ্ভুত ডাকাত!

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

অদ্ভুত ডাকাতের অদ্ভুত ঘটনার কোলাহলে রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাতঃকালে রত্নেশ্বর সিংহ রায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধনেশ্বর সিংহরায়ের নিকট হইতে সমস্ত ধন, সম্পত্তি ও ভূমিসম্পত্তি অর্দ্ধার্দ্ধি ভাগ করিয়া লইলেন। নগদ টাকা, গহনা ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ নিজের লোক দিয়া, কপিলপুরে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন এবং স্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের পাকা বন্দোবস্ত ঠিক-ঠাক্ করিয়া, শিষ্য বা জামাতা যাদবেন্দ্র রায়, স্নেহের কন্যা সরলা এবং নিজের দলবলকে লইয়া, শুভযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

তখন ধনেশ্বর কনিষ্ঠকে বলিল, "ভাই, আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, তোমাতে আমাতে একসঙ্গে এই সামুটী গ্রামের পৈত্রিক বাটীতেই বাস করি।"

রত্নেশ্বর বলিলেন, "আপনি যা বোল্‌ছেন, তা সত্য। কিন্তু আমি ভেবে দেখ্‌লেম, নির্ব্বাণোন্মুখ

অগ্নি বাতাসের আভাস পেলে আবার ভীষণ বেগে জ্বোলে উঠ্তে পারে।"

ধনেশ্বর বলিল, "না, ভাই! কোন চিন্তা নাই। অগ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ নয়—অগ্নি নির্ব্বাপিত।"

রত্নেশ্বর মনে মনে বলিলেন, "অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত।" মুখ ফুটিয়া বলিলেন, "দাদা! আমি স্বতন্ত্র থাক্তেই মনস্থ কোরেছি।"

ধনেশ্বর আর কিছু বলিল না। সে জানিতে পারিল, রত্নেশ্বরের মন একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর জুড়িবে না।

অনন্তর রত্নেশ্বর অগ্রজকে প্রণাম করিয়া স্বদলবল সহিত কপিলপুরে প্রস্থান করিলেন। জাঁক জমকে বাদ্যভাণ্ড করিয়া বরবধূ যাইতে লাগিল।

এ দিকে নলিকান্তের পিতা বরবধূ লইয়া নিজ গ্রামে প্রস্থান করিলেন।

ধনেশ্বর ও ভামিনী ভাঙা হাট আগুলিয়া রহিল। প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর চণ্ডীমণ্ডপের যেরূপ দশা হয়, ধনেশ্বরের বাড়ীর অন্দর বাহিরও তেমনি হইল।

সামুটীগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর গ্রামে অদ্ভুত ডাকাতের অদ্ভুত ব্যাপারের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ধনেশ্বরপ্রপীড়িত লোকেরা বলিতে লাগিল, "এখনও ধর্ম্ম আছেন।"

দশম পরিচ্ছেদ।

সমাপ্তি।

যথাসময়ে মহাসমারোহে রত্নেশ্বর সিংহ রায় কন্যা, জামাতা ও স্বরূপ প্রভৃতিকে লইয়া কপিলপুর পঁহুছিলেন।

মহামায়া পুত্রশোকে কাঁদিতেছিল। ধ্রুবময়ী ওরফে কমলা এবং স্নেহময়ী তাহাকে সান্তনা করিতেছিল। এমন সময়ে রত্নেশ্বর সিংহ রায় গভীর আনন্দভরে একহস্তে যাদবেন্দ্রের এবং অপর হস্তে সরলার হস্ত ধরিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মহামায়ে! আজ তোমার ঋণের কিয়দংশ পরিশোধ করি। এই নেও তোমার হারানিধি যাদবেন্দ্র। এই নেও তোমার পুত্রবধূ।"

সকলেই অবাক্ ও বিস্মিত হইল। মহামায়া যাদবেন্দ্রকে পাইয়া, "বাপ আমার, বাপ আমার!" বলিয়া আনন্দভরে কাঁদিয়া ফেলিল।

যাদবেন্দ্র ভক্তিভরে মাতাকে প্রণাম করিল।

তার পর রত্নেশ্বর হর্ষভরে আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মহামায়ে! তোমার সঙ্গে আজ আমাদের একটা বড়দরের সম্বন্ধ ঘট্‌লো। তুমি আমাদের বেহান্ হলে।" এই বলিয়া সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বলিলেন।

মহামায়া অবাক্! ধ্রুবময়ী অবাক্! স্নেহময়ী

অবাক্! পরক্ষণেই বাড়ী ভরিয়া একটা উত্তাল আনন্দকোলাহল উঠিল।

যাহা পাইবার আর আশা বিশ্বাস ছিল না, তাহাই আবার পাওয়া গেল। দ্রবময়ীর আনন্দের আর অবধি রহিল না। সাশ্রুনয়নে স্নেহের দুহিতা সরলাকে কোলে লইয়া ঘনঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌কে শতশত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যাদবেন্দ্র শ্বশুর ঠাকুরকে বলিল, "গুরু-দেব! আমি আজ গুরুদক্ষিণা দিতে মনন করেচি। অনুগ্রহ কোরে গ্রহণ কোল্লে নিতান্ত বাধিত হব।"

রত্নেশ্বর সহাস্যবদনে বলিলেন, "কি গুরুদক্ষিণা দেবে, বাবা?"

যা। যে সমস্ত ধনসম্পত্তি আপনার কৃপায় লাভ করেচি।"

র। না, বৎস! সে সমস্ত ধনসম্পত্তি তোমারই থাক্। আমি তা কখনই দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ কর্‌বো না।"

যা। আপনি তা গুরুদক্ষিণা না নিলে আমার শিষ্য হওয়া বৃথা। আমি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হব।

র। নিতান্তই যদি গুরুদক্ষিণা দেবে, তবে একটিমাত্র টাকা আমাকে দাও।

যা। (সবিস্ময়ে) সে কি।

র। বাবা! তাই আমার যথেষ্ট। আমি

ভগবান্ হরির নিকট এই প্রার্থনা করি, তুমি যেমন অনেক কষ্ট পেয়েচ, এইবার প্রভূত ঐশ্বর্য্যের প্রভু হয়ে সরলার সহিত চিরকাল সুখস্বচ্ছন্দে ধর্ম্মপথে বিচরণ কর। আমার বা কমলার তোমরাই ঐশ্বর্য্য।”

যা। তবে আপনি এবং শ্বশ্রূঠাকুরাণী আমাদের অভিভাবক হয়ে চিরকাল রক্ষণাবেক্ষণ করুন। দরিদ্র ধনী, ধনী ধনীর আশ্রয়ে ও রক্ষণাবেক্ষণে না থাক্‌লে ধনমর্ম্ম বুঝ্‌বে না। হয় তো নানা প্রলোভনে পোড়ে এবং স্বার্থপর কপট বন্ধু ও প্রবঞ্চক হিতৈষীদের কুহকে মোহিত হয়ে, অল্প দিনেই উৎসন্ন হবে।”

রত্নেশ্বর যাদবেন্দ্রের সারবাক্যে সম্মত হইলেন। কমলাও জামাতার অনুরোধ রাখিলেন।

অনন্তর রত্নেশ্বর সিংহ রায় অভীষ্টসিদ্ধির উপায়স্বরূপ স্বরূপ প্রভৃতি দস্যুগণকে গুণানুসারে প্রতিশ্রুত অর্থ দিয়া কপিলপুরে বাস করাইলেন। যেখানে নিজের কুটীর ছিল, সেইখানে জামাতার অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। জামাতার ভগিনী স্নেহময়ীরও একটি বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী তৈয়ার করিয়া দিয়া, একলক্ষ টাকা নগদ দিলেন। আপনি জামাতার তত্ত্বাবধায়ক হইয়া কমলার সহিত কপিলপুরেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই ক্ষুদ্র কপিলপুর প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ।